ভে ত রে

স্বাধীনতা দিবসে মোদীর ভাষণ ... ২
কিষাণ মহাসভার দেশজুড়ে প্রতিবাদ ... ৩
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে ... ৪
মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গাপুর সফর ... ৫
গৈরিক ষড়যন্ত্রের স্বরূপ ... ৬
সমাজতান্ত্রিকের মোদী আলোচনা নিয়ে প্রশ্ন ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ২৮ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২৮ আগস্ট ২০১৪

চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো চাই।। বন্ধ চা বাগান সব খুলতে হবে।। চা বাগিচা আইনের পূর্ণ রূপায়ণ চাই

শিলিগুড়িতে ২৩টি ট্রেড ইউনিয়নের মহামিছিল

২০ আগস্ট শিলিগুড়ি নগরবাসী প্রত্যক্ষ করল এক অভূতপূর্ব মিছিল ও শ্রমিক সমাবেশ। ২৩টি চা শ্রমিক সংগঠনের ডাকে ৬ হাজারের বেশী সংখ্যায় আদিবাসী, গোর্খা ও রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিকদের জঙ্গী মিছিল শুরু হল বেলা ১২টার সূর্য মাথায় নিয়ে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন চত্বর থেকে। লাল, তেরঙ্গা, সবুজ ঝাণ্ডার ঢল নামে রাজপথে। ব্যস্ত শহরের যানবাহনের স্রোত স্তব্ধ করে সমস্ত রাজপথ জুড়ে চলতে থাকে শ্লোগানের ঝংকার তোলা মহামিছিল। এমন অভূতপূর্ব জনস্রোতকে উৎসাহিত করতে নগরবাসীরা সারিবদ্ধভাবে রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে পড়েন। মিছিল প্রায় ৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সামিল হয় শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত বাঘাযতীন পার্ক ময়দানে।

এ আই সি সি টি ইউ-র জেলা নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে চা শ্রমিকদের এই দুর্বার মিছিল ও সমাবেশে সামিল হয় তরাই সংগ্রামী চা শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক নেতা ও কর্মী বাহিনীর সঙ্গে বড় সংখ্যায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বন্ধুরা। সকাল থেকে এই কর্মসূচি সফল করে তুলতে সচেষ্ট থাকেন এ আই সি সি টি ইউ এবং সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের জেলা নেতা মোজাম্মেল হক, অপু চতুর্বেদী, গৌরী দে, কল্লোল চক্রবর্তী; সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির নেত্রী মীরা চতুর্বেদী, রুবী সেনগুপ্ত, মুক্তি সরকার সহ পবিত্র সিংহ, শরৎ সিংহ, লালু ওরাওঁ, লালদেও রাউতিয়া, চানেশ্বর সিংহ; এ আই এস এ নেত্রী শাশ্বতী সেনগুপ্ত, যুবনেতা অমিত চক্রবর্তী, প্রলয় চতুর্বেদী প্রমুখ।

শিলিগুড়িতে সবহারা শ্রমজীবী মানুষের মহামিছিলের সম্মুখ ভাগ।

মিছিল ও সমাবেশ থেকে আওয়াজ ওঠে—রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে চা শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করতে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে, চা বাগান মালিক-কর্তৃপক্ষকে সেই মজুরি কাঠামো মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে অনতিবিলম্বে বন্ধ চা বাগানগুলো খোলা ও কার্যকরিভাবে চালাতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করতে হবে, বন্ধ বাগানে অনাহারে মৃতদের পরিবারগুলোকে কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, চা শ্রমিকদের স্বোপার্জিত পি এফ ও গ্রাচ্যুইটি তছরুপকারী মালিকদের গ্রেপ্তার ও তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে, ১৯৫১ সালে প্রবর্তিত বাগিচা আইনকে পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়িত করতে হবে, মজুরি চুক্তি নিয়ে টালবাহানা মানছি না মানব না।

রাজ্যবাসী অবগত আছেন ইতিমধ্যে ছমাসে ডুয়ার্সের ৬টি চা বাগানে অনাহারে মৃত শ্রমিক পরিবারের সদস্যের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে গেছে। অন্যতর জীবিকার অভাবে মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন আরও অনেক অশক্ত, অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকেরা। গত ২০০১ সালের ৩১ মার্চ স্বাক্ষরিত মজুরি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও মালিক-কর্তৃপক্ষ ৫টি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বিফল হওয়ার পরেও আগামী ৩ বছরের জন্য বছরে মাত্র ১০ টাকা করে মজুরি বাড়াতে চাইছেন। অথচ বিগত ৩ বছরে খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর মূল্যমানের সাপেক্ষে উপভোক্তা মূল্য সূচক (কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স) বেড়েছে ২৫০০ পয়েন্টের বেশী। স্বভাবতই আগামী ৩ বছরের শেষে ২০১৭ সালের মূল্যমানের বিচারে মাত্র ৩০ টাকা দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি (বর্তমানে দৈনিক মজুরি যেখানে মাত্র ৯৫ টাকা) শ্রমিক পরিবারগুলোকে আরও বেশী করে অনাহার ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। এই সহজ সত্য বুঝতে কোনও মানুষের মাথা খুঁড়তে হয় না। অন্যদিকে বাগিচা আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের প্রাপ্য ভর্তুকি সহ রেশন, বাসস্থান, পানীয় জল সরবরাহ, বাগান ভিত্তিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি আবশ্যিক চাহিদাগুলোকে মালিকেরা ক্রমশ সঙ্কুচিত করে তাদের মুনাফার পাহাড় বাড়িয়ে চলেছে। জীবন-জীবিকা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ও মর্যাদা আদায়ের দাবিতে পাহাড়, ডুয়ার্স, তরাইয়ের ছোট-বড় চা বাগানের শ্রমিকেরা আজ তাই এককাট্টা হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে হাজির।

উত্তরবঙ্গের চা বাগান শ্রমিকদের ২৩টি

তিনের পাতায় দেখুন

রাজ্যে বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কলকাতায় দুদিনব্যাপী অবস্থান

উদার আর্থিকনীতির কারণে আমাদের রাজ্যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সহ বহু বেসরকারি শিল্প ও সংস্থা বন্ধ ও রুগ্ন হয়ে গেছে। ডানলপ, হিন্দমোটর, ডাকব্যাগ, ২০টি চটকল, চা বাগান, ছোট লৌহ ইস্পাত কারখানা, সিমেন্ট কারখানা, বেশ কয়েকটি সুতাকল বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার উদাহরণ।

বিভিন্ন শিল্প ও সংস্থায় কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী অফিসাররা যুক্তভাবে শিল্প সংস্থার পুনরুজ্জীবন প্রকল্প কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং বি আই এফ আর-এর কাছে জমা দিয়েছে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি, বিগত তিন বছরে তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ। দাদাগিরি, তোলাবাজি, জমি দখল, ছাঁটাই, লক আউট, সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক, শ্রমিক খুন, ইউনিয়ন দখল—এটাই হল আজকের শিল্প পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে ২০টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে, অনেকগুলো রুগ্ন। ফলশ্রুতিতে কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়ে গেছেন। ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকরা। অপরদিকে এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে ১৪টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রুগ্নতায় আক্রান্ত। যেখানে কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারী এখনও কর্মরত। রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে অনেকগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এবং বর্তমানে ১৫টির মত সংস্থা রুগ্নতার কারণে ধুঁকছে। এর বাইরে আমাদের রাজ্যে ছোট, মাঝারি ও বড় কারখানা সংস্থা মিলিয়ে সহস্রাধিক কারখানা-শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে গত কয়েক বছরে। বেশীরভাগটাই মালিকপক্ষের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, ভাগ-বাটোয়ারার বিরোধ, কার্যকরী মূলধনের অভাব অথবা ক্রমবর্ধমান তোলাবাজি, সিণ্ডিকেট রাজের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে নতুবা রুগ্নতার শিকার হয়ে বন্ধের মুখে। যার জন্য শ্রমিক-কর্মচারীরা আদৌ দায়ী নয়, অথচ তাঁরা কর্মচ্যুত হয়ে পরিবার সহ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। পরিবহণ শিল্পে রাজ্যের সঠিক কোন পরিবহন নীতি না থাকার কারণে সরকারি-বেসরকারি সি এস টি সি, সি টি সি, দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, ভূতল পরিবহনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহণের শ্রমিকরা নিয়মিত বেতন সহ অন্যান্য পাওনা পাচ্ছেন না। অবসরপ্রাপ্তরাও পেনশন পাচ্ছেন না। চটকলে মজুরি চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও বন্ধ চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও মহার্ঘভাতা নিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়নি।

এই অবস্থার পরিবর্তন সহ রাজ্যে বন্ধ কারখানা খোলা ও রুগ্ন শিল্প কারখানা পুনরুজ্জীবনের দাবিতে এ আই সি সি টি ইউ, সি আই টি ইউ,এ আই টি ইউ সি সহ সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন সমূহ গত ২৫-২৬ আগস্ট কলকাতার রাণী রাসমনি রোডে দু-দিনব্যাপী গণ অবস্থান কর্মসূচী পালিত করে। ২৫ আগস্ট দুপুরে ব্যাপক শ্রমিক-কর্মচারীর জমায়েতে অবস্থান কর্মসূচী শুরু হয়। সি আই টি ইউ-র রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন। এই অবস্থানে এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বসু, রাজ্য সভাপতি অতনু চক্রবর্তী, রাজ্যের অন্যতম সম্পাদক দিবাকর ভট্টাচার্য বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য রাখেন। সারা রাতব্যাপী এই অবস্থানে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখার শিল্পীরা, পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের বাবুনি মজুমদার, শান্তনু ভট্টাচার্য গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ২৬ আগস্ট দুপুরে এ আই সি সি টি ইউ সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পেশ করেন। এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষ থেকে বাসুদেব বসু প্রতিনিধিত্ব করেন।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শ্রম আইন বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ, বিদেশী বিনিয়োগ ও রাজ্যে তৃণমূল সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আগামীদিনে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন জোরদার করার মেজাজ নিয়ে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকরা নিজের কর্মস্থলে ফিরে যান।

স্বাধীনতা দিবসে মোদীর ভাষণ
ঢক্কানিনাদ ও বাকচাতুরীর আড়ালে প্রকৃত বাস্তবতার উদ্‌ঘাটন

এখন সেই সময় যখন ঢক্কানিনাদ ও বাকচাতুরীর পর্দাকে সরিয়ে এবারের স্বাধীনতা দিবসে মোদীর ভাষণকে খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে এবং তা করতে হবে কর্মনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত তার সরকারের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করতে পারে তার সংকেত পাওয়ার জন্য।

লিঙ্গ বাছাই করে গর্ভপাত ঘটানো থেকে কৃষকদের আত্মহত্যা, সাম্প্রদায়িক হিংসার মত এক গুচ্ছ অস্বস্তিকর প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী সুকৌশলিভাবে এমন সমস্ত শব্দ চয়ন করেছেন যা 'সকলের জন্য প্রশাসন'-এর এক ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তিনি যা বলেছেন তার সঙ্গে তাঁর সরকার, বিজেপি নেতৃবৃন্দ এবং সংঘ পরিবার প্রকৃতই যা করেছে তার কোন মিল নেই।

ধর্ষণ নিয়ন্ত্রণে অভিভাবকদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর ভাষণে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে। কিন্তু তাঁর নিজেরই মন্ত্রীসভায় ধর্ষণে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি কিভাবে জায়গা পেল তার কোন উত্তর তাঁর ভাষণে নেই। এর চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, ধর্ষণ নিয়ন্ত্রণে তিনি অভিভাবকদের বলেছেন, ''আমাদের মেয়েদের উপর যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপিত রয়েছে ছেলেদের উপরও সেই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ চাপাতে হবে।'' কিন্তু যে সমস্ত নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তাঁরা বারবারই বলছেন যে, ধর্ষণের হাত থেকে তাঁদের রক্ষার নামে তাঁদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা চলবে না। এছাড়া, ঘটনা হল, ''ছেলেদের উপর নিয়ন্ত্রণ'' ইতিমধ্যেই চাপানো রয়েছে, কেননা, অন্য জাত বা সম্প্রদায়ের মেয়েদের প্রতি তাদের প্রেমকে ''ধর্ষণ'' বলে ছাপ মারা হচ্ছে। যে খাপ পঞ্চায়েতগুলো ভিন্ন জাতে বিয়ে করা দম্পতিদের হত্যা করে এবং যে সমস্ত নৈতিক পুলিশের দল দম্পতিদের একে অপরের হাতে 'রাখি' বাঁধতে বাধ্য করে তারা কিন্তু শেষমেষ মেয়ে এবং ছেলে উভয়ের উপরই ''পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেয়''। স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিন আর এস এস নেতা জি গুরুমূর্তি বললেন যে, ভারতীয় নারীরা 'লাজুক কিন্তু নির্লজ্জ নয়', আর স্বাধীনতা দিবসের পরদিনই গোয়ার এক বিজেপি মন্ত্রী গোয়ার সমুদ্রতটে বিকিনি পরিহিত মেয়েদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির আহ্বান জানালেন। মোদীর ভাষণে তাঁর দলের সেই সমস্ত লোকেদের ভর্ৎসনার কোন আভাসই ছিল না যারা নারীদের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চায়; এর বদলে তিনি ''ছেলেদের উপর নিয়ন্ত্রণ''-এর বচন দিয়ে মেয়েদের উপর নিয়ন্ত্রণকে ''ভারসাম্যমূলক করে তুলে'' ঐ সমস্ত নিয়ন্ত্রণকে বৈধ করে তুললেন।

একইভাবে লিঙ্গ বাছাই করে গর্ভপাত না করার জন্য ডাক্তারদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'আবেদনও' বিশ্বাসযোগ্য নয়। আইনকে বলবৎ করা এবং যে সমস্ত ডাক্তার ঐ বেআইনি কাজ করবেন তাদের শাস্তি দেওয়া সম্পর্কে তাঁর সরকারের কি পরিকল্পনা রয়েছে সে সম্পর্কে মোদী নীরব থেকেছেন।

মোদী বাক্যবাগীশের ঢঙে প্রশ্ন তুলেছেন ''সাম্প্রদায়িকতা থেকে কে লাভবান হয়েছে'' এবং ''সাম্প্রদায়িক হিংসা ১০ বছর বন্ধ রাখার'' আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সুপরিকল্পিত সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রকল্প সম্পর্কে একটি শব্দও ব্যয় করেননি। উত্তরপ্রদেশে ''সাম্প্রদায়িকতা থেকে কে লাভবান হয়েছে'' তা একেবারেই স্পষ্ট—মোদী নিজে এবং বিজেপি। মোদী নিজে যখন মাংস শিল্পের প্রসঙ্গটি (যার মধ্যে গরু জবাই যুক্ত) ''গোলাপি বিপ্লব'' রূপে অভিহিত করে তাতে সাম্প্রদায়িক রং চড়ান, তখন সেটা কি সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়নি? উত্তরপ্রদেশে অমিত শাহ ও বিজেপি যখন গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্ষণকারী বলে ছাপ মেরে এবং সহমতের ভিত্তিতে দুজনের পলায়নকেও ''ধর্ষণ'' বলে অভিহিত করে ধর্ষণের বিষয়টিতে সাম্প্রদায়িক রং চড়ান, তখন কি সেটা সাম্প্রদায়িকীকরণ হয় না? শিশুদের ঝগড়া থেকে মাইক নিয়ে বিবাদের মত সম্ভাব্য সমস্ত বিষয়কে ধরেই বিজেপি কি সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুনকে উসকিয়ে তুলছে না?

স্বাধীনতা দিবসের কিছুদিন আগে আর এস এস প্রধান হিন্দুস্তানে বসবাসকারী সমস্ত মানুষই হিন্দু বলে ঘোষণা করে ভারতবর্ষের ধারণাটির প্রতিই এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। মোদীর নিজের রাজ্যে যে পাঠ্য পুস্তকগুলোকে স্কুলের শিশুদের জন্য অবশ্যপাঠ্য করা হয়েছে—এবং যেগুলোকে জাতীয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংঘ পরিবার চাপ দিচ্ছে—সেগুলোর বিষয়বস্তু সংস্কারাচ্ছন্নতা ও আজগুবিতে মণ্ডিত, যা মোদীর প্রগতি ও সম্মুখদর্শী উন্নয়নের দাবি থেকে একেবারেই আলাদা। ভারতবর্ষের হিন্দু রাষ্ট্র হওয়া সম্পর্কে আর এস এস-এর ঘোষণা এবং বাটরা লিখিত পাঠ্যপুস্তকগুলো সম্পর্কে মোদীর স্বেচ্ছাকৃত নীরবতা ''সকলের জন্য প্রশাসন'' সম্পর্কে তাঁর দাবিকে মেকি বলে প্রতিপন্ন করছে।

একইভাবে মোদী আঞ্চলিক হিংসার নিন্দা করেছেন; এবং তা করেছেন যখন আঞ্চলিক উগ্র জাত্যাভিমানি হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত শিবসেনা তাঁর সঙ্গেই কেন্দ্রে ক্ষমতার অংশীদার। মোদী জাতপাতগত হিংসার নিন্দাও করেছেন, যদিও বিহারে রণবীর সেনার দলিত গণহত্যার সঙ্গে সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা কোন গোপন ব্যাপার নয় এবং তামিলনাড়ু থেকে বিজেপির মিত্র পি এম কে দলিতদের ওপর ধারাবাহিকভাবে হিংসা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাজপেয়ী জমানার 'মুখোশ সূত্র' নতুন আদলে ফিরে আসছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর 'সকলকে নিয়ে বচন' আড়াল করতে চাইছে ঐ একই প্রধানমন্ত্রীর জমানায় আর এস এস-এর অবাধে তার এজেণ্ডাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারার ব্যাপারটাকে। বাজপেয়ী জমানায় এন ডি এ-র ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচী আর এস এস-এর মার্কামারা ইস্যুগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার আওতার বাইরে রেখে সংঘ পরিবারের উপর যা হোক একটা নিয়ন্ত্রণ অন্তত আরোপ করেছিল। এবারে ঐ ধরণের কোন আনুষ্ঠানিক ন্যূনতম কর্মসূচী নেই, আর তাই আর এস এস প্রকাশ্যেই সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারছে। আর এস এস এবং বিজেপি যখন খোলাখুলিভাবে শিক্ষা থেকে নারীর অধিকার, সাম্প্রদায়িক হিংসা থেকে বিদেশনীতি, সমস্ত ক্ষেত্রেই সংঘ পরিবারের বক্তব্য ও অনুশীলনকে আরও বেশি মাত্রায় বৈধ করে তোলার জন্য চাপ দিচ্ছে, মোদী তখন এই সমস্ত কিছুকে ''সকলের জন্য প্রশাসন''-এর এজেণ্ডার মুখোশ দিয়ে আড়াল করতে চাইছেন।

মোদী শুধু এই ইঙ্গিতটুকু দেওয়ার জন্যই কৃষকদের আত্মহত্যার যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং এক লক্ষ টাকার বীমা কোন পরিবারকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে। তিনি এই বিষয়টার মুখোমুখি হতে অস্বীকার করেছেন যে, কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনাগুলো ঘটছে কৃষকদের এবং কৃষিকে কর্পোরেশনগুলো ও বিপর্যয়ের কবলে ঠেলে দেওয়ার সরকারি নীতির কারণে। আমার দেখেছি, ইউ পি এ সরকারের ঋণ মকুবের মত প্রসাধনিক পদক্ষেপ কৃষকদের আত্মহত্যাকে রোধ করতে পারেনি, কেননা সেটা ছিল ''কল খুলে রেখে মেঝে মোছার'' মত ঘটনা। মোদীর 'প্রধানমন্ত্রী জন-ধন' প্রকল্পের পরিণতিও একই হবে, যদি না সরকার ঋণ চক্রের ফাঁদে কৃষকদের বন্দী করার নীতিকে পাল্টায়।

'আর্দশ গ্রাম' সম্পর্কে মোদী যা বলেছেন তা একটা ধাপ্পা, কেননা গ্রামীণ ভারতে জমি ও জীবিকার ওপর সরকারের মদতে চালনো কর্পোরেট আগ্রাসন সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন। মাওবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জনগণকে বন্দুক ধরার বদলে লাঙ্গল ধরতে বলেছেন, কেননা এর মধ্য দিয়েই রক্তপাত বন্ধ হবে। এই ছলনামূলক বক্তব্য প্রকৃত বাস্তবতাকে আড়াল করে। আসল ব্যাপারটা হল, পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীই বন্দুক চালিয়ে নিজেদের জমি রক্ষায় রত কৃষক ও আদিবাসীদের হত্যা করে, আর এই সমস্ত হত্যাকে 'মাওবাদীদের' হত্যার নামে সমর্থন করা হয়। শুধু এই নয়, 'মাওবাদ'-এর জুজুকে যতটা না সশস্ত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় তার চেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর এবং এমনকি প্রতিবাদী গানকে স্তব্ধ করে দিতে। স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিন মোদীর দলের ছাত্র শাখা এ বি ভি পি মুম্বইয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের এক উৎসবে দলিত গায়ক ও আন্দোলনের কর্মী শীতল শাঠে যাতে বক্তব্য রাখতে না পারেন তার জন্য হিংসা চালানোর হুমকি দেয়।

মোদী বিশ্বের কর্পোরেশনগুলোর কাছে ''এখানে আসুন, ভারতে তৈরি করুন'', এই উদাত্ত আহ্বান জানান। বিশ্ব ''ভারতে তৈরি ছাপ'' দেখবে, এজন্য তিনি যুবকদেরও গর্ববোধ করতে বলেন। এটা সুবিদিত যে, বাংলাদেশ, মেক্সিকো, তাইওয়ান, হণ্ডুরাস, চীন ইত্যাদির মত যে সমস্ত দেশ সস্তা, নমনীয় ও শোষণীয় শ্রমিক বাহিনীর যোগানে রাজি থাকে, সেগুলোই হয়ে ওঠে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর কাঙ্খিত গন্তব্য। ''ওমুক দেশে তৈরি'' মার্কায় যে সমস্ত দেশ অগ্রগণ্য সেগুলো সবই তাদের কারখানায় চরম শোষিত শ্রমিক বাহিনীর জন্য পরিচিত এবং এটাও সবাই জানে যে, সে দেশগুলোতে এমন দমনমূলক সরকার রয়েছে যারা ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়া ও প্রতিবাদ করার শ্রমিকদের অধিকারকে চূর্ণ করে। মোদীর সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শ্রম আইনকে প্রত্যাহার করা বা সেগুলোকে লঘু করে তোলার পদক্ষেপ শুরু করেছে যাতে করে সস্তা শ্রমকে শোষণ করা সহজতর ও তীব্রতর করে তোলা যায়। এই এজেণ্ডার উপরই ভিত্তি করে রয়েছে ''ভারতে তৈরি করুন''-এর গালভরা আহ্বান।

একথা ঠিকই যে, যোজনা কমিশন জনগণের চোখে অত্যন্ত কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে, কেননা, মন্টেক আলুহওয়ালিয়া দরিদ্র বলে গণ্য হওয়ার যে অবাস্তব মানদণ্ড ঘোষণা করেছেন সেটা দিয়েই জনগণ এই সংস্থাকে বিচার করেন। কিন্তু যোজনা কমিশনের পুরোপুরি বিলোপ ঘটানোটা হল কল্যাণ-কেন্দ্রীক মিশ্র অর্থনীতির শেষ চিহ্নটিকেও ছুঁড়ে ফেলে কর্পোরেটে আধিপত্যে চালিত বাজার অর্থনীতির স্বৈরাচারকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা।

মোদীর ভাষণে লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত থেকেছে ''সুদিন''-এর কথা, তাঁর প্রতিটি নির্বাচনী ভাষণেই যে কথার উল্লেখ ছিল। প্রতিশ্রুত সুরাহা, পরিবর্তন এবং নতুন বীক্ষা ও কর্মনীতির ধারেকাছে না গিয়ে মোদীর সরকার এবং স্বাধীনতা দিবসে তাঁর ভাষণ যা করছে তা পুরনো, অসম্পন্ন প্রকল্পগুলোকে উন্নয়নের আনকোরা দূরদৃষ্টি বলে নতুন মোড়কে হাজির করা ছাড়া অন্যকিছু নয়।

ভারতের জনগণ বাক চাতুরীর দ্বারা প্রতারিত হতে আর রাজি নন। তাঁরা বাস্তবে সরকারের কর্মনীতি ও কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। মূল্যবৃদ্ধি এবং ভারতীয় কর্পোরেশন ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোর দ্বারা জমিগ্রাস ও সস্তা শ্রমের শোষণকে ''উন্নয়ন''-এর নামে নতুন মোড়কে ও নতুন মার্কায় হাজির করার উদ্যোগ তাঁরা মেনে নেবেন না; একইভাবে সহ্য করবেন না, কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সাম্প্রদায়িকতা ও পিতৃতন্ত্রের রাজনীতিকেও।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ১৯ আগস্ট ২০১৪)

সম্পাদকীয়

আরও কত ধর্ষণ হলে পরে ...

নদীয়ার চৌমুহা থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির সুনিয়া, তারপর খোদ মেদিনীপুর শহর, তারপর আবার পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি, তারপর ...! ঘটনার পর ঘটনা ঘটেই চলেছে। প্রায় প্রতিদিনের ব্যাপার। থামাথামি নেই। ধর্ষণ-গণধর্ষণের হুমকি বা সেটা করে মালুম পাইয়ে দেওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারপরে মেরে লাশ করে দেওয়া, ঝুলিয়ে দেওয়া, রহস্যপূর্ণ মৃতা বা আত্মঘাতী প্রচার করে দেওয়া। এ সবই এখন এ রাজ্যে এক স্থায়ী ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। এটা যেমন ঘটছে সামাজিক ক্ষেত্রে, তেমনি শাসকদলেরও ক্ষমতা-আধিপত্য-মস্তানি দেখানোর দস্তুর। কীর্তি স্থাপনের সারিতে রয়েছে যেমন সমাজের অভিজাত-উচ্চবিত্তবর্গীয় যৌন অপরাধীরা, তেমনি বিশেষত 'নাম কিনছেন' পার্লামেন্ট-বিধানসভা- পুরসভা-পঞ্চায়েতে শাসকদলের তথাকথিত জনপ্রতিনিধিরা। শেষোক্তদের মাথার ওপরে আছেন দাদা-নেতারা, সর্বোপরি সুপ্রীমো নেত্রী। অভিযোগ উঠলে তাঁরাই সব চমৎকার সামাল দেওয়ার নেতৃত্ব ফলাচ্ছেন। সবচেয়ে মুশকিল আসানের উপায় হলেন মুখ্যমন্ত্রী। আশ্বাসের এই বার্তা শাসকদলের সর্বস্তরে প্রচারিত। অতএব বাধো বাধো লাগবে কেন ধর্ষণ-হত্যার বীরত্ব ফলাতে! দলের ওপরতলার কাছে নিচতুলায় দলতন্ত্রের দাপট কায়েমের ক্ষমতাটা নিশ্চিত বুঝিয়ে দিতে পারলেই হল। তাহলেই যে যৌন লালসা চরিতার্থ করতে হোক বা প্রতিপক্ষকে চূর্ণ করতে হোক—ধর্ষণ-গণধর্ষণে সবুজ সংকেত মিলছে। দলনেতৃত্বের দিক থেকে মদত জুটিয়ে দেওয়ার চল তৈরী হয়েছে হরেকরকমের। অভিযোগ উঠলে উড়িয়ে দেওয়া, উদাসীন থাকা, উপেক্ষা করা, রসাত্মক মজা উপভোগ করা, পুরুষতান্ত্রিক 'নৈতিক পুলিশী' প্রদর্শন, পাল্টা শাসক সন্ত্রাসের সমাবেশ ঘটানো এবং থানা-পুলিশ-আদালত সবকিছু ম্যানেজ করা। কখনও কখনও বলা হয় 'খোঁজ নিয়ে' বলার কথা। 'খোঁজ' বলতে দলের চ্যানেলে খোঁজ। সে খোঁজ আর নেওয়া হয় না। খোঁজের খবর জানতে গেলে হয়রানিতে শেষ হয়ে যেতে হয় কিংবা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার শাসানীর সম্মুখীন হতে হয়।

চৌমুহাতে তৃণমূল সাংসদ যে জঘন্য হুমকির নজীর স্থাপন করেছেন তা 'তাপস পাল কালচার' নামেই কুখ্যাত হয়েছে। সেই কালচারের ফলিত প্রয়োগই ঘটেছে সুনিয়ায়, সেখানে তৃণমূলী পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও তার ভৈরববাহিনী বিরোধী দলকে ক্ষমতার মত্ততা বুঝিয়ে দিতে এক স্থানীয় বিরোধী দলনেতার স্ত্রীকে গণধর্ষণ ও হত্যা করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এই বর্বরতা ঘটতে দেখে তবু মুখ্যমন্ত্রীর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সুনিয়ায় যা ঘটেছে সেটা সিঙ্গুরে ঘটা তাপসী মালিকের পরিণতিরই পুনরাবৃত্তি। মেদিনীপুর শহরে ''রেপ-মার্ডার'' করে দেওয়ার হুমকি দেখানোর অভিযোগ উঠল খোদ তৃণমূলের উপ-পুরপ্রধান ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ হল, এক মা-মেয়ের পরিবারের জমি বিক্রীর সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার। উপ-পুরপ্রধানটি যুক্ত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জমি বিক্রীর দালালীতে। জমির ক্রেতা অর্ধেক টাকা সরাসরি দিয়েছেন বিক্রেতাকে, অর্ধেক দিয়েছেন দাবি করেছেন মধ্যস্থতাকারিকে। তারই বিহিত চাইতে গেলে মিলেছে 'রেপ-মার্ডারের' হুমকি, আর থানাও দিয়েছে খেদিয়ে। খবর বৈদ্যুতিন চ্যানেলে প্রকাশ হয়ে গেলে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর গুডবুকে থাকা পশ্চিম মেদিনীপুরের মহিলা পুলিশ সুপার বলেছেন, 'অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সত্যিই কি নেওয়া হবে? সন্দেহের আরও কারণ হল, তৃণমূল মহাসচিবের দায়সারা প্রতিক্রিয়া। ধর্ষণ-গণধর্ষণকে হাতিয়ার করার এই শাসন-সংস্কৃতি শুধুমাত্র বিরোধীপক্ষদের বিরুদ্ধে ব্যবহারে থেমে থাকছে না। এমনকি তৃণমূলের ভেতরেও ক্ষমতা প্রদর্শনের সেই বীভৎসতা লক্ষ্যণীয়। অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শক্তিমান গোষ্ঠীর আধিপত্যবাজীতে। অনুরূপ ঘটনার অভিযোগ উঠেছে নন্দীগ্রাম লাগোয়া খেজুরিতে। দলের এক পঞ্চায়েত সদস্যাকে বাড়িতে ঢুকে পরিবারের সকলের সামনে বিবস্ত্র করে মারধোর করা হয়, গণধর্ষণের চেষ্টা হয়। তার আগে পরিবারটিকে সামাজিক বয়কটের হুকুম জারী করা হয়েছিল। এই জুলুমবাজী চালানোর অভিযোগ শাসকদলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি ও তার গুণ্ডাদলের বিরুদ্ধে। পুলিশের সি আই বলেছেন, এরকম অভিযোগের কথা জানা নেই। আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্যা আক্রমণকারি সভাপতির ঘোর অপছন্দের, সেই আক্রোশ থেকেই যৌন আক্রমণ নেমেছে। অভিযোগ উঠেছে শুনে তৃণমূলের কাঁথি সাংসদ বলেছেন, 'দলের ভেতরের ব্যাপার', 'তুচ্ছ ঘটনা'।

এভাবেই ধর্ষণ-গণধর্ষণের নিগ্রহ উৎসাহিত হচ্ছে শাসকদলের ধৃতরাষ্ট্রবাদী ভূমিকায়। আরও কত হলে পরে পশ্চিমবঙ্গকে ধর্ষণের রাজ্য বলা যাবে!

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য

১৬-১৭ আগস্ট, ২০১৪ মাইথনে (ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড) কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের শুরুতে কমরেড নবারুণ ভট্টাচার্য ও মধুকর সিং (উভয়েই এম-এল আন্দোলনের সহযোগী প্রখ্যাত লেখক), তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিশ্বরঞ্জন দাস, তৃপ্তিময় ত্রিবেদী, রামনারায়ণ রাই ও টি পি শ্রীবাস্তব (শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের নেতা) এবং সুরেন্দ্র সিং, বুদ্ধদেব মাঝি, বিন্দেশ্বর পাশোয়ান (সকলেই পাটনার কমরেড), অভিমন্যু পাশোয়ান (জাহানাবাদ), ভৃগুরাম সাউ আকা বিমল (ভোজপুর), দীনেশ আকা বিক্রম (রোহতাস), সুনীল কুমার (ভাগলপুর), লালচাঁদ ভগৎ (গোপালগঞ্জ) এবং ২৫-২৭ মে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বিগত বৈঠকের পর থেকে প্রয়াত অন্যান্য পার্টি ক্যাডার ও সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির মূল মূল সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার ঃ

নতুন সরকারের কর্পোরেটমুখী ও সাম্প্রদায়িক এজেণ্ডাকে প্রতিহত করা সম্পর্কে—

ক) ক্ষমতায় আসার পর থেকে নরেন্দ্র মোদী ৩ মাস অতিক্রম করলেন। নরেন্দ্র মোদী সরকারের বাজেটে ও ১৫ আগস্ট মোদীর সাম্প্রতিক ভাষণে নতুন সরকারের অর্থনৈতিক এজেণ্ডা প্রকাশ পায় যাতে বৈদেশিক পুঁজিকে 'ভারতে আসার জন্য' তিনি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এবং প্ল্যানিং কমিশনকে গুটিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এগুলো সরকারের কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলোকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেওয়ার বা কাটছাঁট করার এবং ব্যক্তি পুঁজি ও কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতিকে সমস্ত দিক থেকে অবাধ করে দেওয়ার মনোভাবকেই দেখিয়ে দিচ্ছে। জমি অধিগ্রহণের ও শ্রমশক্তিকে সস্তায় নিংড়ে নেওয়ার কাজকে উৎসাহিত করতে সরকার জমি ও শ্রম আইনের পরিবর্তন ঘটাতে উদ্যত হয়েছে। রেলভাড়া ও খাদ্যবস্তু সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের ব্যাপক বৃদ্ধি সাধারণ মানুষদের ওপর জোরালো আঘাত হেনেছে, এই মানুষেরাই সুসময় নিয়ে আসার জন্য মোদীর প্রতিশ্রুতিতে মোহগ্রস্ত হয়ে মোদীকে ভোট দিয়েছিলেন।

খ) একের পর এক রাজ্য থেকে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ সহ বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে বড় রকমের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার খবর আসছে। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল সম্ভবত সংঘ বাহিনীর হাতে সাম্প্রদায়িক চক্রান্তের গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে যেখানে দলিত ও মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে তারা মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিজেপির অভূতপূর্ব বিজয়ে সামন্ত-সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো উজ্জীবিত এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে ও নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুলিশগিরি করতে সংঘ বাহিনী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গ) সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের চিহ্ন ইতিমধ্যেই দেখা দিতে শুরু করেছে। এই সময়েই বিজেপি তার ভিত্তির বিস্তার ঘটাতে, নিজের ক্ষমতাকে সংহত করতে এবং সামগ্রিকভাবেই নিজের কব্জাকে আরও দৃঢ় করতে এক সার্বিক অভিযান শুরু করেছে। কংগ্রেস এবং বেশীরভাগ অ-বিজেপি পার্টিগুলোকে রক্ষণাত্মক অবস্থানে ঠেলে পাঠানো হয়েছে। বিজেপির অগ্রগতিকে ঠেকাতে বিহার উপনির্বাচনে আর জে ডি, জে ডি ইউ এবং কংগ্রেস জোট করেছে। আমরা সি পি আই (এম) এবং সি পি আই-এর সঙ্গে আসন সমঝোতা করেছি, তবে যে সমস্ত কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে সেখানে বামেদের গণভিত্তি কম।

ঘ) বিজেপির অভূতপূর্ব উত্থান ও ভারতীয় রাজনীতির ব্যাপকভাবে দক্ষিণপন্থী মোড় পরিবর্তন যে চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে তার বিরুদ্ধে এক দৃঢ় ও সুসঙ্গত জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর কেন্দ্রীয় কমিটি জোর দিয়েছে। বামেদের প্রান্তিক করে দেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে আমাদের অবশ্যই পার্টিকে উজ্জীবিত করা ও পার্টির বিস্তার ঘটানোর এক দৃঢ়পণ অভিযান চালিয়ে পাল্টা আঘাত হানতে হবে এবং একইসাথে অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সঙ্গে (সংগঠন, ব্যক্তি, সংগ্রাম ও প্রবণতা/ধারা) আমাদের ঐক্যকে শক্তিশালী করতে হবে।

ঙ) এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি ২৮ জুলাইয়ের আহ্বান ও পলিট ব্যুরোর সার্কুলারের আলোকে পার্টির বিস্তার ও পার্টিকে উজ্জীবিত করতে এবং নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী দৃঢ়পণ অভিযান চালাতে সমগ্র পার্টির কাছে আহ্বান জানিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বাম ও গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক মঞ্চ গঠনের সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি সেল গঠন করেছে। বৃহত্তর গণতান্ত্রিক মঞ্চের ভাবনাটি এ আই এল সি অনুমোদন করেছে। একইসাথে এ আই এল সি-র বাইরের বাম পার্টিগুলোর সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক যৌথ কাজের সম্ভাবনাকেও পার্টি খতিয়ে দেখবে।

শিলিগুড়িতে ...মহামিছিল

একের পাতার পর

ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ ''জয়েন্ট ফোরাম'' পরিবর্তিত রাজনৈতিক-সামাজিক সঙ্কটের এই সন্ধিক্ষণে তাই এই বিশাল শ্রমিক সমাবেশ গড়ে তুলে শ্রমিকদের মরণপণ লড়াইয়ে সামিল করাতে সফল হচ্ছে। সরকার ও মালিক-কর্তৃপক্ষের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে জয়েন্ট ফোরামের নেতৃত্বে বিগত ২ মাসের মধ্যে ডুয়ার্সের বানারহাট, কালচিনি, মালবাজার, তরাইয়ের বাগডোগরা ও দার্জিলিং পাহাড়ের মহতি শ্রমিক কনভেনশন সংগঠিত হয়েছে। মহামিছিল ও সমাবেশের আগে সর্বত্র সংগঠিত হয়েছে একাধিক মিছিল, প্রচার চলেছে পুরো দমে। ফলশ্রুতিতে অতি বর্ষণকে উপেক্ষা করে ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়ের শ্রমিকেরা দলবদ্ধভাবে সবাই ইউনিয়নের ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিলে সামিল থাকতে ভোররাতেই ঘর ছেড়েছেন; ট্রেন, ট্রাক ও ছোট গাড়ি জোগাড় করে এসে তাঁরা সমবেত হয়েছেন। তিন ঘন্টা ধরে চলা সমাবেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থেকেছেন শেষ অবধি। এমনকি সমাবেশের শেষে আবার দৃপ্ত মিছিল করে দাবিসনদ পেশ করেছেন শ্রমিক দপ্তরে।

এই মহামিছিলের নেতৃত্বে থাকেন ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জয়েন্ট ফোরামের অংশীদার চা শ্রমিকদের সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক চিত্ত দে, জিয়াউল আলম, এন ইউ পি ডব্লিউ-র নেতা প্রভাত মুখার্জী, ইউনাইটেড টি ওয়ার্কার্স ফ্রন্টের পক্ষে তিলক চাঁদ রোকা ও জন বার্লা, কিরণ কালিন্দি, ডিফেন্স কমিটির পক্ষে কে বি সুব্বা ও রাজীব সান্যাল, তরাই সংগ্রামী চা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে অভিজিৎ মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ চা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা অমল রায়, নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যানস্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষে অভিজিৎ রায়, দার্জিলিং জেলা চা-কামান মজদুর ইউনিয়নের পক্ষে সমন পাঠক, টি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা মুরারী মিত্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল টি গার্ডেন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে পার্থ গোস্বামী প্রমুখ।

পরবর্তী ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মালিকপক্ষ ন্যূনতম মজুরি কাঠামোর নিরীখে প্রয়োজনের সমতুল (প্রয়োজনভিত্তিক মজুরি) ঘোষণা না করলে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রতিশ্রুতির প্রতিধ্বনি নিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৯ আগস্ট সারা ভারত কিষাণ মহাসভার দেশজুড়ে প্রতিবাদ

অখিল ভারতীয় কিষাণ মহাসভা কৃষকদের দাবিকে তুলে ধরতে, বিশেষভাবে জমি অধিগ্রহণ আইনকে লঘু করে তোলা এবং জিন সংশোধিত (জি এম) শস্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোয় অনুমতি দেওয়ার বিরুদ্ধে ৯ আগস্ট সারা ভারতে প্রতিবাদ দিবস সংগঠিত করে। এই প্রতিবাদের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ণা, পদযাত্রা ও জনসভাগুলো সংগঠিত হয়। পরবর্তীতে অবশ্য জি এম শস্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্থগিত করা হয়, কিন্তু কৃষকদের স্বার্থের চেয়ে কর্পোরেট স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সরকারের অভিপ্রায় নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিভিন্ন রাজ্যে সংগঠিত কর্মসূচী সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল।

ঝাড়খণ্ড

গিরিডি জেলার সদরে পূরণ মাহাতো ও সিতারাম সিং-এর নেতৃত্বে ধর্ণা ও জনসভা সংগঠিত হয় যাতে ২৫০০ কৃষক অংশগ্রহণ করেন। সেদিনের জনসভায় কিষাণ মহাসভার সাধারণ সম্পাদক রাজারাম সিং কৃষকদের সামনে বলেন, মোদী সরকার জমি অধিগ্রহণ বিলকে সংশোধন করে কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে যে সুবিধা দিতে চাইছে তা কৃষকদের তাদের অধিকার থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত করবে। ২০১৩-র জমি অধিগ্রহণ বিল থেকে যেটুকু সুবিধা তারা পেয়েছিল সেটুকুও তাদের হারাতে হবে। প্রস্তাবিত ঐ সংশোধনী সারা দেশে খাদ্য সুরক্ষাকেও বিপর্যস্ত করে তুলবে। ঐ বিলে বাধ্যতামূলকভাব ৭০ শতাংশ কৃষকের সম্মতি নেওয়া, সামাজিক প্রতিক্রিয়া যাচাই করার যে ধারা রয়েছে, মোদী সরকার সেগুলোকে তুলে দিতে চাইছে। বর্তমান বিলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাজার দরের ৬ গুণের বদলে রয়েছে মাত্র ৪ গুণ। মোদী সরকার শুধু এটাকে তুলে দিয়েই ক্ষান্ত হতে চাইছে না—অধিগৃহীত জমির ওপর নির্ভরশীল কৃষি শ্রমিক ও কারিগরদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে বিধান রয়েছে সেটাকেও তুলে দিতে চাইছে। বর্তমান বিলে অধিগৃহীত জমি ব্যবহৃত না হলে কৃষকের ঐ জমিতে চাষবাসে যে অধিকার রয়েছে, সেটাকেও বিলোপ করার চেষ্টা হচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে বহু ফসলি জমি অধিগ্রহণের পথে বাধাকে দূর করার। কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছেন যে, জমি অধিগ্রহণ বিলের পরিবর্তে জমি সংরক্ষণ বিল আনা হোক। যথাযথ গবেষণা ও অনুসন্ধান ছাড়াই মোদী সরকার জি এম বীজ নিয়ে চাষে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিপদজনক সবুজ সংকেত দিয়েছে, যার সুদূরপ্রসারি বিপর্যয়কর ফলাফলের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলোর চাপেই সরকার ধান, গম, শাকসব্জি, বেগুন, ডাল ও তৈল বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনুমোদন দিয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে তীব্রতর করে তোলার আহ্বান তিনি জানান।

গিরিডি ছাড়াও রামগড়, বোকারো ও গাড়োয়া জেলাতেও সেদিন প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়।

উড়িষ্যা

এই রাজ্যের ২০টি জেলা বন্যায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, যার মধ্যে পুরী অন্যতম। কিষাণ মহাসভার কর্মীরা ত্রাণ সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে পাঠাচ্ছেন। যথাযথ ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য পুরী জেলার বিভিন্ন ব্লকে প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। বন্যা বিপর্যয় সত্ত্বেও ৩০০-রও বেশি কৃষক ৯ আগস্ট পুরী থেকে রাজ্য রাজধানী ভুবনেশ্বরে এসে প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচীতে যোগ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে একটি প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করার পর জমি অধিগ্রহণ বিলকে সংশোধিত করে তোলাটা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়। এরই সাথে যথাযথ ত্রাণ সরবরাহের দাবিও জানানো হয়।

উত্তরপ্রদেশ

৯ আগস্ট প্রতিবাদ দিবস পালনের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, যথা গাজিপুর, গোরখপুর, পিলভিট, ফুলপুর, বেরিলি, মথুরা, লখিমপুর খেরি, বালিয়া, চন্দৌলি, আজমগড়, কুশিনগরে ধর্ণা ও প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। ধর্ণা ও সভাগুলোতে বহু সংখ্যক কৃষক ছাড়াও সাধারণ মানুষও যোগদান করেন। সভাগুলোতে বক্তারা মোদী সরকারের কর্পোরেটপন্থী ও কৃষক বিরোধী চরিত্রকে তুলে ধরেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিবাদ সম্বলিত স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়।

বিহার

পাটনার গান্ধী ময়দানের নিকট কারগিল চকে ৯ আগস্ট কিষাণ মহাসভা এক বিশাল ধর্ণা সংগঠিত করে। ঐ ধর্ণায় ভালো সংখ্যক নিম্ন-মধ্য কৃষক ছাড়াও ভাগচাষী এবং অন্যান্য স্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেন। জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয় যাতে বিহারকে খরা কবলিত রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা এবং যথাযথ ত্রাণ সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থা ও রেশন সরবরাহের দাবি জানানো হয়। আরও দাবি জানানো হয় পুনপুন, দারধা ও মোরহার নদী থেকে পাইপের মাধ্যমে কার্যকরী সেচ ব্যবস্থা করার। বৈশালি, মহুয়া, লালগঞ্জ এবং ভোজপুর জেলা সদর আরাতেও প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয় এবং দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়। আরও প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয় রোহতাস জেলার সদর সাসারামে, ঔরঙ্গাবাদ ও জাহানাবাদ জেলার সদরে। বক্সার জেলার সদরে প্রতিবাদ সভায় সোন খালের নিম্ন এলাকাগুলোতে জল সরবরাহ এবং কাদোঁয়া বাঁধ প্রকল্পের দ্রুত সমাপ্তির দাবি জানানো হয়। আরওয়াল জেলার সদরে প্রতিবাদ সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। এছাড়াও প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয় বিহারশরিফ, বেগুসরাই জেলার সদরে, ভাগলপুর জেলার কাহালগাঁওয়ে, পূর্ণিয়া, সিওয়ান, গোপালগঞ্জ, মুজফ্ফরপুর ও পাটনা সিটিতে। এই সভাগুলো ও ধর্ণার প্রস্তুতি হিসাবে ব্যাপক সংখ্যক প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রতিবাদ সভাগুলোতে বক্তারা মোদী সরকারের কৃষক-বিরোধী চরিত্র উন্মোচিত করেন এবং ২৯ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর সময়কাল ধরে প্রতিবাদ সভা উদ্‌যাপিত করে প্রতিবাদকে তীব্রতর করে তোলার কথা ঘোষণা করেন। ঐ সময় বিভিন্ন ব্লকের সদরে প্রতিবাদের মাধ্যমে বিহারকে খরা কবলিত রাজ্য বলে ঘোষণা করা, যথাযথ সেচ ব্যবস্থা করা, রেশন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবি জানানো হবে। গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন পদযাত্রা সংগঠিত করে ৬ থেকে ১২ অক্টোবর ''কিষাণ জাগরণ সপ্তাহ'' পালন এবং ব্যাপক সংখ্যক কৃষকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্তকেও ঘোষণা করা হয়।

উপরোক্ত রাজ্যগুলো ছাড়াও রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে ধর্ণা ও প্রতিবাদ সভাগুলো সংগঠিত হয়। সেগুলোতে কৃষকরা ভালো সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন। কোথাও কোথাও রাজ্যের নির্দিষ্ট দাবিগুলো উঠে আসে। যেমন পাঞ্জাবকে খরা কবলিত রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা এবং কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনাগুলোকে বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। মহারাষ্ট্রে বন্ধ চিনিকলগুলোকে খোলা এবং শ্রমিকদের নতুন বেতন হার নির্ধারণের দাবি জানানো হয়। ন্যূনতম ৩০০০ টাকা বেকারভাতা দেওয়ার দাবিও উঠে আসে।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে ১ সেপ্টেম্বর মহামিছিলে যোগ দিন

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর। হিটলারের নাজি বাহিনী আক্রমণ করল পোল্যাণ্ড। রিবেনট্রপ-মলোটভ চুক্তি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে **অক্ষ-শক্তি**-র (এক্সিস পাওয়ার) এই আগ্রাসন ও দেশ দখলের অভিযানের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫-এর ২ সেপ্টেম্বর। ৬ বছর ১ দিনব্যাপী যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় নিহত মানুষের সংখ্যা ৭ কোটি ৩০ লক্ষ। যার মধ্যে নিরাপরাধ সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছিলেন ৪ কোটি ৯০ লক্ষ এবং সামরিক বাহিনীর লোকজন মারা গিয়েছিল ২ কোটি ৪০ লক্ষ (অসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা সামরিক মৃত্যু সংখ্যার দ্বিগুণ)। ১৯৪৫-এর ৬ এবং ৯ আগস্ট হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বিধ্বংসী পারমাণবিক বোমায় যুগ যুগ ধরে মারণ রোগে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যু ও বিকলাঙ্গ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ইতিহাস উল্লিখিত বড় বড় সংখ্যার বাইরে। গোটা মানব সভ্যতা এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে পড়েছিল। যুদ্ধের বিপরীতেই গড়ে উঠেছিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও শান্তির আকাঙ্খা। ইতিহাস তাই মুছে দিতে পারেনি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের দৃঢ়পণ প্রতিরোধের কাহিনীকে।

১৯৪১ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্বজুড়ে এই দিনটি পালিত হয় বিশ্ব শান্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের দিন হিসাবে। আনুষ্ঠানিক দিবস পালন ও বিমূর্ত শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হওয়ার কথা নয়। একবিংশ শতাব্দীও প্রত্যক্ষ করছে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতি (অর্থনীতি-সমাজনীতি সহ)। ২০১৪-র সেপ্টেম্বর কলকাতা ও রাজ্য যখন উত্তাল হবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির সপক্ষে, তখন প্যালেস্তাইন ও গাজার রাস্তায় ছিন্নভিন্ন হয়ে শিশুদের অবশিষ্টাংশগুলো পড়ে থাকবে, মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের বিমান ও নৌ সেনাদের গোলায় ধ্বংস হয়ে যাবে কোন হাসপাতাল, স্কুলবাড়ী, জনবসতি। যুদ্ধবাজরা বাড়ীগুলোর মাথায় রেড-ক্রস চিহ্ন বা সাদা পতাকাগুলোও নাকি দেখতে পায় না। সাম্রাজ্যবাদ ও তার ধারক-বাহক বুদ্ধিজীবীকুল আমাদের শুনিয়েছিল অবাধ গণতন্ত্র ও শান্তির কথা, পেন্টাগনের যে ইতিহাসবিদ্ (ভদ্রলোকের নাম ফ্রান্সিস ফুকিয়ামা) আমাদের জানিয়েছিলেন 'এণ্ড অব হিস্টরি' (ইতিহাসের অবসানের) গল্প তারা আজ ইরাকে লাগাতার ড্রোন আক্রমণ ও কার্পেট বম্বিং-এর পর বা গাজা ও প্যালেস্তাইনে ধ্বংসযজ্ঞের স্বরূপ (৫০ দিনব্যাপী) দেখে কি বলবেন, আমাদের জানা নেই। বলা ভাল, ওরা বলবেন, এভাবেই সাম্রাজ্যবাদ ও তার পোষ্যদের হাত ধরে উদার গণতন্ত্র ও শান্তির কবুতর আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ১৯৪৫-এর ২ সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ, আগ্রাসন, দেশ দখলের রাজনীতি ও অর্থনীতি রোখার জন্য নাকি গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্রসংঘ (ইউ এন ও)। রাষ্ট্রসংঘের মাতব্বর ও শক্তিধর দেশগুলোকে নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল নিরাপত্তা পরিষদ (সিকিউরিটি কাউন্সিল)। এই রাষ্ট্র সংঘ-ই ১৯৪৮-এর ১৪ মে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্যালেস্তাইনের বুকে ইজরায়েল তৈরীর পূর্বে ১৯৪৭-এর ২৯ নভেম্বর ১৮১ নম্বর প্রস্তাবে (রেজেলিউশন ১৮১) প্যালেস্তাইনকে ত্রিখণ্ডিত করে আরব প্যালেস্তাইন, ইহুদী ইজরায়েল ও শহর জেরুজালেম তৈরীর বিভাজনের রাজনীতিকে জন্ম দিয়েছিল (ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের ব্রিটিশ রাজনীতি স্মরণ করুন), তার নীটফল ৭ লক্ষের বেশি প্যালেস্তানীয় মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে (স্থানীয় ভাষায় নাকভি) গাজা ও পার্শ্ববর্তী প্যালেস্তাইনে আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯৪৮-এ ইজরায়েল গঠনের ৫ দিনের মধ্যে জায়নবাদীরা শুরু করল হামলা ও এলাকা দখলের যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে উপনিবেশবাদ বিরোধী লড়াই যখন তুঙ্গে তখন আরব ভুখণ্ড ও মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ ও আমেরিকার উপনিবেশ গড়ে তোলার প্রত্যক্ষ ফসল এই ইজরায়েল। মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়ার তেলের খনিগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার স্বার্থে যুদ্ধ, আগ্রাসন ও সংঘর্ষের রাজনীতিকে মদত ও পৃষ্ঠপোষকতা। মিলিটারী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স (সামরিক-শিল্পীয় অর্থনীতির মেশিন)-কে সঙ্গী করেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি তার আধিপত্য ও আগ্রাসনের জাল বিস্তার করে চলেছে। গাজা, প্যালেস্তাইন, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডন তথা তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোতে যুদ্ধ, হত্যা ও ধ্বংসের রাজনীতির নেপথ্য কাহিনী এখানেই জড়িয়ে আছে।

মার্কিন মদতপুষ্ট ন্যাটোর হামলা পূর্ব দিকে আরও অগ্রসর হয়েছে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তান হয়ে তা ভারতের দোড়গোড়ায়। ভারত মহাসাগরে দিয়াগো গার্সিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত মার্কিন রণতরীর উপস্থিতি আমাদের সকলেরই জানা। এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা জুড়ে পৃথিবীর পয়লা নম্বর দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসরদের বাজার দখলের রাজনীতি ও অর্থনীতি ডেকে এনেছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, লুণ্ঠন, দুর্ভিক্ষ, ধ্বংস ও যুদ্ধের বিভীষিকা।

১৯০ বছর ধরে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-সঞ্জাত চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভারতের আপামর জনগণ তাই বারে বারে উত্তাল হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, যুদ্ধ, বর্ণবিদ্বেষ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। ভিয়েতনাম থেকে ভেনেজুয়েলা, কঙ্গো থেকে কিউবা, প্যালেস্তাইন থেকে পাকিস্তান, ইরাক-ইরান থেকে ইউক্রেন যেখানেই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, হামলা ও যুদ্ধের রাজনীতি আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে কলকাতা সোচ্চার হয়েছে। এই কলকাতাই আওয়াজ তুলেছে—''তোমার নাম, আমার নাম, ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম''। ভারতের তল্পিবাহক বৃহৎ পুঁজিপতিরা ও তাদের মুখপাত্ররা যতই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির কাছে নতজানু হোক না কেন, ভারতীয় জনগণ কখনই তাকে মেনে নিতে রাজী হয়নি।

আজ দিল্লীতে ক্ষমতায় বসেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী-বিদেশী কর্পোরেট সংস্থাগুলোর তল্পিবাহক আর এস এস এবং বিজেপির সরকার। এই সরকার ভারতের জনগণের দীর্ঘদিনের বন্ধু প্যালেস্তাইনের জনগণের লড়াইকে সমর্থন করা তো দূরের কথা, এমনকি মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের অন্যায় যুদ্ধ বন্ধ করার দাবি জানিয়ে সংসদে ন্যূনতম প্রস্তাব পর্যন্ত গ্রহণ করতে রাজী নয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছেন—''ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব নষ্ট হোক, তা আমরা চাই না''। সুষমা স্বরাজ চাইবেন-ই বা কি করে? ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পে '১০০ শতাংশ এফ ডি আই'-এর প্রধান হোতা তো ইজরায়েল ও তার প্রভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইজরায়েলী 'মোসাদ' বাহিনীই ভারতীয় সেনবাহিনীর 'জঙ্গী দমনে' নিযুক্ত বিশেষ বাহিনী ও স্কোয়াডগুলোতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। নিরীহ জনগণকে কিভাবে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় তার প্রশিক্ষণ-ই দিচ্ছে 'মোসাদ' খুনীরা। এফ ডি আই আর মোসাদ-ই তো মোদী বাহিনী এবং আর এস এস-এর 'বন্ধু'! সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই, যুদ্ধ ও আগ্রাসন বিরোধী লড়াই, আন্দোলন, মিছিল, সমাবেশ তাই নিশ্চিতভাবেই ভারতের শাসকশ্রেণীগুলোর প্রতিনিধি মোদী সরকার এবং আর এস এস বিরোধী লড়াইয়ের সাথে একসূত্রে বাঁধা। ১ সেপ্টেম্বরের মিছিল থেকে মোদী সরকার ও আর এস এসের বিরুদ্ধে আওয়াজও আমাদের তুলতে হবে।

১। সেপ্টেম্বরের মিছিল ও সমাবেশ কোন বিশেষ বামপন্থী গোষ্ঠী বা দলের আহ্বানে সংঘটিত হচ্ছে না। রাজ্যের সমস্ত বামপন্থী দল, সংগঠন, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গ এই মহামিছিলে স্বাগত। দৃষ্টিভঙ্গী বা নীতিগত প্রশ্নে দলগুলোর মধ্যে ভিন্নতা বা পারস্পরিক বিরোধিতা থাকলেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই মিছিল-সমাবেশকে আমরা মোটেই ছোট করে দেখতে পারি না। সমস্ত সংকীর্ণতা ত্যাগ করে কলকাতা আর একবার আওয়াজ তুলুক—''তোমার নাম, আমার নাম, প্যালেস্তাইন, প্যালেস্তাইন''।

যে শ্লোগানগুলো আমরা তুলব—

- **গাজা ও প্যালেস্তাইন গণহত্যা বন্ধ কর**
- **মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েল প্যালেস্তাইন থেকে হাত ওঠাও**
- **মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা থেকে হাত ওঠাও**
- **প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলী অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতের সংসদকে নিন্দা প্রস্তাব নিতে হবে**
- **ভারত-প্যালেস্তাইনের জনগণের ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক**
- **ভারতকে এফ ডি আই-র মৃগয়াক্ষেত্র বানানো চলবে না**
- **নো ওয়ার, অনলি পীস**
- **স্টপ ওয়ার ইন গাজা**
- **মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্য থেকে হাত ওঠাও**
- **বামপন্থী দলগুলোর ডাকা ১ সেপ্টেম্বরের মহামিছিলে সামিল হোন**
- **জল-জমি-জঙ্গলের কর্পোরেট লুঠ বন্ধ কর।**

- পার্থ ঘোষ

বামপন্থী বৃহত্তর উদ্যোগের আহ্বানে

১ সেপ্টেম্বর মহামিছিল

স্থান ঃ রামলীলা ময়দান (মৌলালীর নিকটে)

সময় ঃ দুপুর ২টা

নদীয়ায় জেলা শাসককে বিড়ি শ্রমিকদের গণডেপুটেশন

কৃষ্ণনগর টাউন হলের মাঠে বিড়ি শ্রমিকরা জমায়েত হয়ে মিছিল করে জেলার প্রশাসনিক ভবনে যান। মহিলা বিড়ি শ্রমিকরা সামিল হন হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে। শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি, পরিচিতিপত্র, পেনশন, জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা করা, আলু-পেঁয়াজ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া; সাংসদ তাপস পালের অপরাধমূলক অশালীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবিতে বিড়ি শ্রমিকরা মিছিলে সোচ্চার হন। শ্রমিকদের হাতে এ আই সি সি টি ইউ-র প্ল্যাকার্ডে ছিল একপ্রস্থ দাবির।

জেলা শাসককে দেওয়া স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়—নদীয়া জেলায় লক্ষাধিক বিড়ি শ্রমিক রাজ্য সরকারের ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি পান না। এ বিষয়ে জেলার শ্রমদপ্তর ও প্রশাসনিক কর্তারা কোন দায়িত্ব পালন করছেন না। শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিক ৭৫ টাকার বেশী মজুরি পান না। বিড়ি মালিকরা বিভিন্ন কায়দায় বিড়ি প্যাকেট করে বিড়ির দাম বাড়িয়ে মুনাফা বাড়াচ্ছেন অথচ বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি অগ্রাহ্য করছেন। ওয়েলফেয়ার দপ্তর দীর্ঘদিন বিড়ি শ্রমিকদের নতুন পরিচয়পত্র দেওয়া বন্ধ রেখেছে। শ্রমিকদের জন্য ভ্রাম্যমান চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ডাক্তার নির্ধারিত জায়গায় আসেন না, রোগীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না। এককথায়, ওয়েলফেয়ারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে জুটছে বঞ্চনা ও হয়রানি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই দপ্তর শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে অগ্রাহ্য করছে।

নদীয়া জেলায় দিনদিন বাড়ছে মহিলাদের ধর্ষণ, খুন, অত্যাচার, অপমান। এই যৌন হিংসা ছড়ানোর ও খুনে হুমকি দেওয়ার চূড়ামনি হল কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ তাপস পাল। সরকার এ বিষয়ে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে? শ্রমিকরা এটা জানতে চান। তারা এ বিষয়ে বিচার ও শাস্তি চাইছেন। জেলাশাসক প্রত্যুত্তরে বলেছেন দাবির কথা সরকারকে জানাবেন।

ডেপুটেশনে পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রামী বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন অমল তরফদার, বেলা নন্দী, গৌরী সরকার, আশা মণ্ডল, উন্নতি সরকার, সবিতা বিশ্বাস, অর্চনা মণ্ডল। জেলা শাসকের পক্ষ থেকে বলা হয় শ্রমিকদের মজুরি, পরিচয়পত্র, পি এফ-লগবুক ইত্যাদি বিষয়ে জেলার শ্রমদপ্তরে এবং ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে জানাবেন। উনি জানান, আমরা জেনেছি বিড়ি শ্রমিকদের আপডেট করা ফর্মে বিড়ি মালিকদের সিল, সই এবং বিডিও অফিসে পরিদর্শকের স্বাক্ষর লাগবে না। হয়রানি বন্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ডেপুটেশন থেকে ফিরে শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক অমল তরফদার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কি আলোচনা হল, প্রতিশ্রুতি মিলল সেসব উপস্থিত বিড়ি শ্রমিকদের সামনে পরিষ্কার করে বলেন। শ্রমিকরা লড়াকু মেজাজে সবকিছু শোনেন। দেড় শতাধিক বিড়ি শ্রমিক ডেপুটেশন মিছিলে অংশ নেন। অবস্থান চলাকালীন বক্তব্য রাখেন বিজয় সাহা ও বিপ্লব বাগচী।

১০০ দিনের কাজ
বন্ধ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে
সরকারি মজুরি ২০৬ টাকা চালু করা
এবং
বি পি এল কার্ডের দাবিতে

সারা ভারত কৃষি মজুরি সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির উদ্যোগে

১ সেপ্টেম্বর, ১৫ ভাদ্র

জেলা শাসকের দপ্তরে গণঅবস্থান

মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গাপুর সফর হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী

তিনি গেলেন, পক্ষী বিতানে পাখীর কাকলি শুনলেন। স্বহস্তে পাখীদের দানা খাওয়ালেন। সাগর পাড়ের হাওয়া খেলেন। 'খোকাবাবুর' নাচ দেখলেন। সবশেষে নিজের অনুভূতি বোঝাতে বললেন, 'প্লাস, প্লাস, প্লাস'। তাঁর প্রধান অমাত্য তৃপ্তির উদ্‌গার তুললেন। ঘৃতের সুবাস পেয়েছেন যে! ধনপতিদের সংস্থা ঋণ জোগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ঋণের টাকায় ঘি খাওয়া হবে। প্রবাদেই তো আছে ঃ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হবুচন্দ্র রাজা নন, নব্য বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রধান অমাত্য অমিত মিত্র। গবুচন্দ্র মন্ত্রী নয়, এ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। কিন্তু তাঁদের সিঙ্গাপুর সফরে সত্যি সত্যিই রূপকথার 'হবুচন্দ্র রাজা, গবুচন্দ্র মন্ত্রীর' মশলাদার সুবাস।

পশ্চিমবঙ্গে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা রুগ্ন হয়ে পড়ার কারণে শ্রমিক-কর্মচারীদের যে দুর্গতি শুরু হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় তার নিরসন হওয়ার পরিবর্তে সমস্যা আরও প্রবলতর হয়েছে। পুঁজির অভাবে ও পুরনো প্রযুক্তিকে বদলানোর সামর্থ্যের অভাবে ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলো নিত্যদিন বন্ধ হয়ে চলেছে। ভারি ও বৃহদায়তন শিল্প মালিকরা ফাটকা কারবারে আরও মুনাফার মওকা দেখে এবং নতুন প্রোজেক্টের গল্প শুনিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে মোটা লোন বাগিয়ে নিয়ে এবং সবশেষে শ্রমিকদের পাওনা মেরে দিয়ে কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে। ক্ষুদ্র শিল্পের সংকটকে কীভাবে রোধ করা যায়, অসাধু শিল্পপতিদের পুঁজি পাচারকে কীভাবে ঠেকানো যায়—তার জন্য পরিশ্রম, পরিকল্পনা ও কঠোর প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চটকদারি দিয়ে বাজি মাত করতে চাইলেন। তিনি সপারিষদ সিঙ্গাপুর যাত্রার জন্য বিমানে চড়ে বসলেন। রাজ্যের পুরনো শিল্প কারখানাগুলোতে মড়ক লেগেছে তো কী হল! সিঙ্গাপুর থেকে টবে করে তিনি শিল্পের চারা এনে এখানে শিল্পের ফুল ফুটিয়ে দেবেন।

লগ্নি আকর্ষণ না বিনোদনের সফর?

সফরের শুরুতে অবশ্য মমতা দেবীর মারকাটারি মেজাজটা দেখা যায়নি। বরং তিনি বেশ কিছুটা রক্ষণাত্মক ছিলেন। যেমন তাঁর স্বগতোক্তি ভেসে এসেছে, ''গত পনের বছরে এই তো প্রথম বিদেশ যাওয়া। তাও তো ঘরের কাছেই সিঙ্গাপুর যাত্রা।'' প্রশ্ন বিদেশ সফর নিয়ে নয়। প্রশ্ন একটা বিনোদনের জন্য ভ্রমণকে 'লগ্নী আকর্ষণের জন্য সফর' তকমা দেওয়ায়।

মুখ্যমন্ত্রীর চার দিনের সিঙ্গাপুর সফরে বেশী সময় কীভাবে কেটেছে? তিনি জুরং পক্ষী বিতানে বেড়িয়েছেন, সান্টোস দ্বীপ পরিভ্রমণ করেছেন, সিঙ্গাপুরের বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া পার্টিতে সাংসদ-অভিনেতা দেবের নাচ-গান উপভোগ করেছেন, মেরিটাইম মিউজিয়ামে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। বলতে কি তাঁর এই ভ্রমণ পিপাসু চাপল্য দেখে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লিউ টিপ্পনি কেটেছেন, 'খারাপ কি, এবার আমাদের চিড়িয়াখানাটাও দেখে যান দুদণ্ড।' আর সঙ্গে সঙ্গে গদগদ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে এই বলে সওগাত দিয়েছেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লি সিয়েনের বাবার নামে (লি কুয়ান ইউ—সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) একটা 'চেয়ার' করে দেওয়া হবে।

শিল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুরে আদৌ যে প্রচেষ্টা চালাননি তা অবশ্য বলা যাবে না। তবে সেখানে শিল্পকলারই প্রাধান্য বেশী থেকেছে। তিনি বলেছেন, চাঙ্গি বিমান বন্দরে 'বিশ্ব বাংলা স্টল' বানিয়ে দেবেন। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য 'বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলনে' তিনি সিঙ্গাপুরি শিল্পপতিদের আমন্ত্রণও জানিয়েছেন। মোদ্দা কথা, শিল্প অর্থে যে ইণ্ডাস্ট্রি সেটাই তাঁর সফরে গৌন থেকেছে। তাঁর সফর সঙ্গীদের দীর্ঘ তালিকায় অবশ্য বেশ কিছু শিল্পপতির নাম ছিল (যেমন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, হর্ষ নেউটিয়া, কর্ণ পল, ওয়াই কে মোদি, পুনিত ডালমিয়া ইত্যাদি)। এঁরা অবশ্য সরকারি পয়সায় নিজেদের ব্যবসার কিছু বকেয়া কাজকর্ম সেরে এসেছেন। এখন তো কালো টাকা নিশ্চিন্তে জমা রাখার ঠিকানা শুধু সুইস ব্যাঙ্ক নয়। কালো টাকার জিম্মাদার হিসেবে হংকং, দুবাই, সিঙ্গাপুরের ব্যাঙ্কগুলোও জমজমাট কারবার চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী শিল্পপতিরা তাঁদের কালো টাকা গচ্ছিত রাখার জন্য সিঙ্গাপুরের ব্যাঙ্কগুলোতে যে সুলুক সন্ধান চালাচ্ছিলেন না তাইবা কে হলফ করে বলতে পারে? তবে হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রীর 'শিল্প সম্মেলনে' (যা সিঙ্গাপুরের হোটেল সাংগ্রিলায় আহূত হয়েছিল) রাজ্য সরকারের তাঁরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ঠিক এরাই কয়েক বছর আগে এই হোটেল সাংগ্রিলাতেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হয়ে গলা ফাটিয়েছিলেন। বুদ্ধবাবুদের কাছ থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে এখন তাঁরা মমতা দেবীর নৌকায় চড়েছেন। সুতরাং দেবীর নৌকা ডুবি ঠেকায় কে? তবে বুদ্ধদেববাবুর পরিণতি থেকে মমতা ব্যানার্জী শিক্ষা নিন আর নাই নিন, বুদ্ধবাবুকে অনুসরণ করতে তিনি ভুল করেননি। বাঁকুড়ার সোনামুখী অঞ্চলে একটি কলেজ তৈরীর জন্য বুদ্ধবাবু কয়লা মাফিয়া কালে খাঁ-র হাত থেকে মোটা টাকার চেক নিয়েছিলেন। আর মমতা ব্যানার্জী তাঁর সিঙ্গাপুর সফরে আর এক কয়লা মাফিয়া কৃষ্ণ কয়ালকে সঙ্গী করেছেন হাসি মুখে।

রাধা নাচুক আর না নাচুক
১৩টা মউ স্বাক্ষর তো হল!

অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানিয়েছেন, একটা 'শিল্প সফরে' সব হয় না। তবে তাঁরা নেটওয়ার্কিং শুরু করলেন। সিঙ্গাপুরের পুঁজিপতিকুল ও বণিকসভা সমূহের সঙ্গে জান পহেচান হল। তাঁর ভাষায় এই সফরের সেরা প্রাপ্তি, সে দেশের সবথেকে বড় সম্পদ ম্যানেজমেন্ট সংস্থা জি আই সি-র সঙ্গে বৈঠক। জি আই সি নাকি ঋণ ও মুলধনি পুঁজি সরবরাহ করতে রাজী হয়েছে। যদি ঋণ সত্যিই বা মঞ্জুর হয়, তা দিয়ে মন্ত্রী, আমলা, নেতা, পুঁজিপতিদের পেট ভরলেও শিল্প যে একটাও গড়ে উঠবে না তা বলাই বাহুল্য। তিন বছরে শিল্পের জন্য মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী, মুম্বাইতে একাধিক রোড শো করেছেন। কিন্তু নতুন করে শিল্পের কোন দরজা খোলেনি।

হ্যাঁ, কিছু পুঁজি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। ডানকুনিতে ১০০০ কোটি টাকায় ফুড পার্ক গড়ে তোলা হবে বলে কেভেন্টার্স গ্রুপের সঙ্গে ইনফ্রা এশিয়ার মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাটার সঙ্গে জি আই সি-সিঙ্গাপুর ও হাইল্যাণ্ড গ্রুপের আবাসন প্রকল্প গড়ার জন্য ২০০ কোটি টাকার মউ স্বাক্ষর হয়েছে। সিঙ্গাপুর সরকারের নগরোন্নয়ন বিভাগ 'সারবানার' সঙ্গে নগরোন্নয়ন ও খাদ্য প্রস্তুতিকরণ বিষয়ক মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এইরকম মোট ১৩টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু এইরকম অজস্র মউ বামফ্রন্ট আমলে এবং টি এম সি জমানাতেও সই হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক আধলাও কেউ বিনিয়োগ করেনি। এর ঢের ঢের উদাহরণ আছে। তার চেয়েও বড় কথা হল, যে সব শিল্পের জন্য প্রাথমিক চুক্তি করা হল, সেই সব শিল্পে বেশী কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। আর এইসব শিল্পের জন্য বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তির জন্য হাত পাতার দরকার পড়ে না।

মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুর সরকারের কাছে জোরালো যে একটা আহ্বান রেখেছেন তার কথা উল্লেখ না করা অন্যায় হবে। তিনি ১৮ মাস সময়সীমার মধ্যে রাজারহাট-নিউটাউনে 'সিঙ্গাপুর-কোলকাতা বাণিজ্যিক কেন্দ্র' গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু যে সরকার অণ্ডালে একটা ছোটখাটো বিমান বন্দরের রানওয়ে তৈরীর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ানো কয়েকটা বিদ্যুতের খুঁটি সরাতে বছরের পর বছর সময় নেয় সে যে ১৮ মাসের মধ্যে একটা ইটও গাঁথতে পারবে না তা জেনে সিঙ্গাপুর সরকার মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান কেবল চুপচাপ শুনে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্লাস, প্লাস প্লাস,
শ্রমিকশ্রেণীর শুধুই মাইনাস

সফর শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুরে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেছেন, 'সুপার্ব (চমৎকার), পজিটিভ, প্লাস, প্লাস, প্লাস।' কী থেকে তিনি এত উৎফুল্ল? তিনি পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য সিঙ্গাপুরী পুঁজিপতিদের যে তথ্য দিয়ে 'মুগ্ধ' করেছেন তা হল—(১) পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জন্য জমির অভাব নেই। এখানে ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক তৈরী হয়েছে। (২) পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘটের কারণে গত তিন বছরে একটাও শ্রম দিবস নষ্ট হয়নি। প্রথমটির জন্য আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। কারণ তথাকথিত এই ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের মতই একটা মস্ত ধাপ্পা। কিন্তু দ্বিতীয় তথ্যটি অনেকাংশে সত্য। টি এম সি প্রশাসন ও দল গুণ্ডামি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। শ্রমিকের ওপর মালিকের যথেচ্ছ অত্যাচার চলবে অথচ প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘটে নামতে পারবে না। নরেন্দ্র মোদীও ঠিক এই জিনিসই চায়। শ্রমিক শ্রেণী এই ফতোয়া মেনে নিলে খেটে খাওয়া মানুষের সমূহ সর্বনাশ। তাই মুখ্যমন্ত্রীর গর্বিত ভঙ্গীকে এই প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণীকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই হবে তা সে সিঙ্গাপুরি কলা থুড়ি সিঙ্গাপুরি পুঁজি এ রাজ্যে আসুক আর নাই আসুক।

- মুকুল কুমার

মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গাপুর ভ্রমণ

শিল্পবন্ধ্যা পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী পুঁজি টেনে আনতে মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুর সফর করে এলেন। সেই ভ্রমণের ফলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিনিয়োগ কেমন এল আর তাতে রাজ্যের আমজনতার কী লাভ হবে তা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তেমন জমলো না। ৯ বছর আগে এমনি এক আগস্ট মাসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বিদেশী পুঁজি আনার সফর অনেক বেশী তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। ইন্দোনেশিয়ার সালেম গোষ্ঠীর বারাসাত-বারুইপুর হাইওয়ে তৈরীর প্রকল্প ও তার ফলে কৃষি জমি কৃষকের হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে বহু কথা চালাচালি হয়েছিল। তাছাড়া সালেমরা ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট নিধনের পাণ্ডার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, এনিয়েও কম কথা হয়নি। সেদিক দিয়ে এবারের মুখ্যমন্ত্রীর সফর তেমন কোন আলোড়ন ফেলল না।

৬০ জন প্রতিনিধি নিয়ে সিঙ্গাপুর সফরের শেষে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকশো কোটি বিদেশী বিনিয়োগের বাইরে তেমন কোন উজ্জ্বল শিল্প সম্ভাবনার দিকনির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীও আমাদের সামনে তুলে ধরেননি। যে সমস্ত বিনিয়োগের কথা শোনা যাচ্ছে তা মূলত রিয়াল এস্টেটে অর্থলগ্নীর বা ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানে লগ্নির। ঐ সমস্ত শিল্পে বিনিয়োগ তেমন কোন স্থায়ী কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি করে না যাতে সাধারণ মানুষের নিরাপদ অন্ন সংস্থানের বন্দোবস্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীরা যখন বিদেশ সফরে যান তখন সাথে নিয়ে যান শিল্পপতি, সংবাদপত্র মালিক বা সম্পাদক, টিভি চ্যানেল ইত্যাদি প্রভৃতিদের। আমাদের মত আম-জনতা মুখ্যমন্ত্রীর পারিষদের অমৃত (অনৃত?) ভাষণ জানতে পারি খবরের কাগজের পাতায়। তাঁর থেকে অনুমান করতে চেষ্টা করি আমাদের ও রাজ্যের সাধারণ অধিবাসীদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের কেমন বন্দোবস্ত করলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। যারা মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হন তাঁরা তাঁদের মুনাফার কথা ভাবেন। মুখ্যমন্ত্রীদের সমস্ত কাজের প্রশংসা করাই তাঁদের কাজ। আমলারাও সে রাস্তাতেই হাঁটবেন। সাথে থাকা সাংসদদেবগণের বা বিল্লুদের তো কথা বলার কথাই নেই। তাই রাজ্যকে উলঙ্গ বলার সাহস দেখানো আমাদের মত আমজনতারই দায়িত্ব।

মমতা ব্যানার্জী তথা তৃণমূল যখন ক্ষমতায় ছিলেন না, বিরোধী ছিলেন, তখন মনে পড়ে সোমনাথ চ্যাটার্জী, যিনি পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন, তাঁকে মৌ দাদা বলে ডাকতেন। সারা পশ্চিমবঙ্গ মৌ (মানে শিল্প বিনিয়োগের সমঝোতা চুক্তি)-এর কথা শুনত, আর বামফ্রন্টের কাণ্ডারীরা বলতেন, শিল্প বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে, আমাদের শিল্পবন্ধ্যা কাটছে। আর সাধারণ মানুষ দেখত রাজ্যে চাকরি নেই, কর্মসংস্থান নেই, আছে প্রমোটারি ও দালালি। শেষে জোর করে জমি দখল, সেজ ইত্যাদি ও বামফ্রন্টের পতন। কেননা সাধারণ জনগণের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার মত কোন বিনিয়োগের বন্দোবস্ত হয়নি। এবারও অনুরূপ কিছু শিল্প সমঝোতা হয়েছে। নেওটিয়া, গোয়েঙ্কা, পোদ্দার, আগরওয়াল এইসব মহান শিল্পপতিগণ, যাদের মধ্যে কেউ আবার ইজরায়েলের ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি, তাঁরা দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর পুঁজি আবাহনের প্রক্রিয়াকে, বাহবা দিয়েছেন, যেমনটা তাঁরা ৯ বছর আগে দিতেন, দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে।

২০১১-১২ সালের বার্ষিক শিল্প সমীক্ষা অনুসারে সারা ভারতে কারখানা ক্ষেত্রের চালু শিল্প কারখানার সংখ্যা ১,৭৫,৭১০টি; যা মোট মূল্যযোগ করেছে ৯,৭৭,৩৫৮ কোটি টাকার, যেখানে সর্বমোট নিযুক্ত ছিল ১,৩৪,২৯,৯৫৬ জন ও কাজ হয়েছে ৪০,৮৭২ লক্ষ শ্রম দিবস, মজুরি দেওয়া হয়েছে ২,৪৮,২২২ কোটি টাকা আর মুনাফা হয়েছে ৪,৫১,৬৩০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৭,৪০৭টি চালু কারখানা, যাতে মূল্যযোগ হয়েছে ২৬,০৪৪ কোটি টাকার, মুনাফা হয়েছে ৪,০২৮ কোটি টাকা, সর্বমোট নিযুক্ত ছিল ৬,৫৪,২৭৬ জন, কাজ হয়েছে ২,০৬১ লক্ষ শ্রম দিবস, মজুরি দেওয়া হয়েছে ১০,৫১৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট চালু কারখানার ৪.২ শতাংশ রয়েছে এ রাজ্যে, যা মোট মূল্যযোগের মাত্র ২.৭ শতাংশের সৃষ্টি করেছে। মোট নিযুক্তির ৪.৮ শতাংশ এ রাজ্যের শ্রমিক, তাঁরা পায় মোট মজুরির ৪.৩ শতাংশ আর কাজ করে মোট কর্ম দিবসের ৫ শতাংশ। হিসেব অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরি সারা ভারতের মজুরির হারের তুলনায় কম, কেননা প্রতি শ্রমদিবস পিছু মজুরির হার পশ্চিমবঙ্গে ৫১০ টাকা, যা সারা ভারতে গড় ৬০৭ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে বাস করে সারা ভারতের ৮ শতাংশ মানুষ, তাঁরা তৈরী করেন সারা ভারতের মোট উৎপাদনের ৭ শতাংশ। সুতরাং সংগঠিত কারখানা ক্ষেত্রের তুলনায় অসংগঠিত কৃষি ক্ষেত্র বা অন্যান্য সেবা বা উৎপাদক শিল্পের গুরুত্ব অনেক বেশী। শিল্প বিনিয়োগের মূল কর্মসূচীটাই হওয়া উচিত ঐসব ক্ষেত্রের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও কৃষি ক্ষেত্রের উৎপন্নকে ব্যবহার করে শিল্পোৎপাদনের। তা যদি করা হয় তবে সাধারণ মানুষের কর্ম সংস্থানও হয় আবার কৃষি ক্ষেত্রের গুরুত্বও বাড়ে। তা না করে প্রচলিত একবগ্গা পথে হংকং-সিঙ্গাপুর ঘুরে বেড়ালে যাদের মুনাফা হয় তাদের বাহবা পাওয়া যাবে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজকোষের খানিক অর্থব্যয় ছাড়া বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না।

- অমিত দাশগুপ্ত

মৌলিক অধ্যয়নের বিষয়

গৈরিক ষড়যন্ত্রের স্বরূপ

- বিনোদ মিশ্র

(এখানে পুনঃপ্রচার করা হচ্ছে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের প্রয়াত নেতা বিনোদ মিশ্রের ১৯৯৩ সালে লেখা ''গৈরিক ষড়যন্ত্রের স্বরূপ'' শীর্ষক একটি মৌলিক বিশ্লেষণী রচনা (সামান্য সংক্ষেপ সহ)। রচনাটির মৌলিকত্ব অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে, সি পি আই (এম এল)-এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র ''লিবারেশন''-এর এপ্রিল, মে, জুন ও আগস্ট সংখ্যায় মোট চার খণ্ডে। — সম্পাদক, আজকের দেশব্রতী)

(গত সংখ্যার পর)

'ধর্মনিরপেক্ষ' হিন্দুধর্ম—সোনার পাথরবাটি!

সংঘ পরিবার আর একটি বক্তব্য বহুবার তুলে ধরেছে—ভারতবাসীর ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু বলেই ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, হিন্দুধর্মের এই তথাকথিত অন্তর্নিহিত সহিষ্ণুতাকে ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে এক করে দেখার ধারণাটি সরকারি 'ধর্মনিরপেক্ষতার'ও গোড়ার কথা। আর তাই ভারত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচারে ক্রমাগত হিন্দু মানসিকতার জয়গানই শোনা যায়।

হিন্দুত্বের সাম্প্রতিক উত্থানের ফলে আজ আমরা দেখছি হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনার সাংঘাতিক বৃদ্ধি, দেশের রাজনীতিতে সাধু-মহান্তদের ক্রমবর্ধমান রমরমা, বজরং দল বা শিবসেনার মত সংগঠনগুলোতে সমাজের যত আবর্জনার একত্রিত হওয়া, মুসলিমবিরোধী হত্যালীলার মারাত্মক বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখায় প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতের বহিঃপ্রকাশ এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতে সমস্ত বিরোধী মতামতের প্রতি ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা। এর থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে একটা নির্ভেজাল হিন্দু রাষ্ট্র মানে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পুরোপুরি নাকচ করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ বেশ কিছু উন্নত দেশ, যেখানে প্রধান ধর্ম খ্রীষ্ট বা বৌদ্ধধর্ম, তারা ভারতের থেকে অনেক বেশী ধর্মনিরপেক্ষ। বিশেষতঃ খ্রীষ্টধর্ম এক সময় অত্যন্ত গোঁড়া ও অসহিষ্ণু ধর্ম ছিল—ইনকুইজিশনের (রোমান ক্যাথলিক যাজকদের তৈরী বিচারসভা) কথা মনে করে দেখুন। অনেক ইউরোপীয় দেশে চার্চও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান। সময়ের ধারাবাহিকতায় খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে বহু ধারার জন্ম হয় এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের সাফল্য রাষ্ট্র ও চার্চের বিচ্ছেদ নিশ্চিত করে। বস্তুত, রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছেদের ওপর ভিত্তি করে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটিই পশ্চিমী দেশগুলোতে সফল বুর্জোয়া বিপ্লবের ফসল।

হিন্দুধর্মের তথাকথিত এই অন্তর্নিহিত সহনশীলতার প্রবক্তারা অবশ্য এর সঙ্গে তুলনা করেন কেবল ইসলামের তথাকথিত অন্তর্নিহিত অসহিষ্ণুতার। হিন্দু জনসাধারণের এক বিরাট অংশ ইসলাম সম্পর্কে এইরকম ধারণাই পোষণ করেন। কাজেই ইসলামের বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে ভাল করে জানা প্রয়োজন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের অধিবাসী বিভিন্ন উপজাতি পরস্পর শক্তিক্ষয়ী এক লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। মরুবাণিজ্যের মন্দা ও তার দরুণ জমির চাহিদায় বৃদ্ধির জন্যই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যুযুধান উপজাতিগুলোর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার আন্দোলন হিসাবেই ইসলাম আত্মপ্রকাশ করে। এই ঐতিহাসিক সময়ে বিভিন্ন উপজাতীয় রীতিনীতির মিলন ও একক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লার প্রতি আনুগত্যের বাণী প্রচার শুরু করেন মহম্মদ। তাঁর নিজের উপজাতি কোয়েরিশের প্রধানরা ও বণিক অভিজাততন্ত্র প্রথমে তাঁর এই মতের তীব্র বিরোধিতা করে। তিনি মক্কা থেকে পালাতে বাধ্য হন। মদিনার মরুদ্যানের কৃষিজীবী জনসাধারণ ছিলেন মক্কার এই অভিজাততন্ত্রের বিরোধী। তাঁরা মহম্মদকে সমর্থন যোগান। এঁদের সাহায্যেই তিনি শেষ পর্যন্ত মক্কা দখল করেন। এক প্রধান ধর্মীয় ও জাতীয় কেন্দ্র হিসাবে মক্কার আবির্ভাবের সাথে সাথে কোয়েরিশ অভিজাততন্ত্রও ইসলাম গ্রহণ করে, এমনকি তার নেতায় পরিণত হয়।

এঙ্গেলসের কথায় ইসলাম ধর্ম ছিল একদিকে শহরবাসী বণিক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের জন্য, আবার একই সঙ্গে যাযাবর বেদুইনদের জন্যও।

আরবদের জাতীয় ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ইসলাম অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বধর্মে পরিণত হয়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে স্পেন থেকে মধ্য এশিয়ার ভারত সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল ভূখণ্ডের একমাত্র ধর্ম হয়ে ওঠে ইসলাম। পরবর্তী শতকগুলোতে এই ধর্ম উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আরও পরে ইন্দোনেশিয়া, ককেশিয়া তথা বলকান রাষ্ট্রগুলোর কিছু কিছু জাতির মধ্যেও এই ধর্মের বিস্তার ঘটে।

নতুন নতুন এলাকা দখল ও তাদের এক করে তুলতে আরবরা যেসব ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ পরিচালনা করেছিল সেগুলো ইসলামের প্রসারে এক প্রধান ভূমিকা নেয়। কিন্তু বাইজানটাইন বা সিসামিড সাম্রাজ্যের মত দেশের জনসাধারণ যে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তোলেননি তার জন্য দায়ী স্থানীয় সামন্তপ্রভুদের মারাত্মক নিপীড়ন। আরবদের বিজিত দেশগুলোতে কৃষক জনসাধারণের, বিশেষতঃ যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের দেয় খাজনা অনেকাংশে কমানো হয়। ভারতে ইসলামের বিস্তারে সাহায্য করেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতিভেদের অমানুষিক নিপীড়ন। প্রাচ্যের পিতৃতান্ত্রিক সামন্ত রাষ্ট্রগুলোতে কৃষক জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল তার সরল রীতিনীতির দরুণ।

পরবর্তীকালে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ও ধর্মনিরপেক্ষ গবেষকরা জিহাদের নির্দেশাবলীকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এমনকি হিন্দুধর্মকেও এক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ-সম্বলিত ধর্ম হিসাবে, রাম ও কৃষ্ণকে তাঁদের যুগের পয়গম্বর হিসাবে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। পাঠক এ প্রসঙ্গে বিহারের মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক মহলে ওঠা এক সাম্প্রতিক বিতর্কের কথা স্মরণ করতে পারেন। কোনও এক মুসলিম পণ্ডিত হিন্দুদের কাফের বলা উচিত নয় বলে মতপ্রকাশ করলে এই বিতর্কের জন্ম হয়।

ইসলামের ধর্মীয় বিধানের ভিত্তিতে নাগরিক আইন ও দণ্ডবিধি সূত্রবদ্ধ আছে—একেই শরিয়ৎ বলে। পিতৃতান্ত্রিক উপজাতীয় মানসিকতা ইসলামের পারিবারিক মূল্যবোধকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল, আর তাই নারী সেখানে পুরুষের অধীন। কিন্তু এই ব্যাপারটা প্রায় সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রেই সত্য। বরং তৎকালীন আরবের নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতিতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচারের নিন্দা করে এবং স্ত্রীলোকের সম্পত্তির অধিকার---পণ ও উত্তরাধিকারের অধিকার—নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে কোরান নারীর মর্যাদাকে কিছুটা বাড়াতেই সমর্থ হয়েছিল।

ইসলাম ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে ধর্মের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হলেও মুসলিম দেশগুলোতে জাতীয় ও শ্রেণীদ্বন্দ্বগুলো বেড়েই চলতে থাকে। এরই প্রতিফলন হিসাবে ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন ধারা ও গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

এদের মধ্যে প্রাচীনতম ও বৃহত্তম গোষ্ঠীটি হল শিয়া। আরবদের আভ্যন্তরীণ লড়াই তথা মহম্মদের উত্তরসূরীদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই হিসাবে এর শুরু হলেও শীঘ্রই তা আরব বিজেতাদের বিরুদ্ধে পারস্যের জনগণের বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের রূপ নেয়। আজও ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম শিয়া। মুসলিম জগতের অধিকাংশই অবশ্য সুন্নি। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে সুন্নিদের একটি গোষ্ঠী, মুজীলাইটরা এক যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম মতবাদকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা বলেন যে কোরান ঈশ্বরসৃষ্ট নয়, মানুষেরই রচনা আর মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। ধর্মীয় বিধানের আক্ষরিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে চলে আসা গোঁড়া ধারার বিপরীতে ইসলামের মধ্য থেকেই এমন কিছু ধারা উঠে আসে যেগুলো এর অনেক উদার ব্যাখ্যা অনুমোদন করে। মুসলিম জগতের অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলোতে এগুলো যথেষ্ট সমর্থন ভোগ করে।

সুফীবাদের সূচনা শিয়াদের মধ্যে হলেও পরবর্তীকালে সুন্নিদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল। সুফীরা বাহ্যিক আচার আচরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না, বরং ঈশ্বরের সঙ্গে মায়াময় মিলনের কথা বলতেন। তাঁদের অদ্বৈতবাদী ধারণা গোঁড়া অর্থে কোরানের থেকে বিচ্যুতিই ছিল। গোঁড়া মুসলিমদের হাতে তাই প্রথমদিকে তাঁদের অত্যাচারিত হতে হয়েছে। পরে অবশ্য একটা আপসরফা হয়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মুসলিম ঐতিহ্যে মৌলিক কিছু পরিবর্তন আসে। বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্রে শরিয়তের প্রভাব সীমায়িত হয়, আইন ব্যবস্থাকে করে তোলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ, আর মুসলিম মোল্লাতন্ত্রের হাত থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করা হয়। তুরস্কে ১৯২০-র দশকে কামাল পাশার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর আমূল কিছু সংস্কার প্রবর্তিত হয়।

ভারত এক্ষেত্রে এক বিরল দৃষ্টান্ত। এখানে হিন্দুধর্মের অসংখ্য দেবদেবী ও মূর্তি পূজার সঙ্গে ইসলাম সহাবস্থান করে এসেছে বহু শতাব্দী ধরে। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে দুটি ধর্মের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। অথচ তৃণমূলস্তরে উভয় ধর্মের সাধারণ মানুষ এক অভিন্ন জীবনযাত্রা, আশা-আকাঙ্খা, এমনকি বহু অভিন্ন বিশ্বাসের অংশীদার। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর যে সমস্ত মুসলিম জনগণ ভারতে থেকে গেলেন তাঁদের যে পাকিস্তানের প্রতি একটা দুর্বলতা থাকবে এটা স্বাভাবিক, ঠিক যেমন পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী হিন্দুদের ভারতের প্রতি দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। দেশভাগের পর ভারতীয় মুসলিমদের রাজনীতি মোটামুটিভাবে কংগ্রেসের চারপাশেই ঘোরাফেরা করেছে। নিজের ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে কংগ্রেস মুসলিম মৌলবাদী শক্তিগুলোকে অনেক সময়ে বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা দিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য হিন্দু মৌলবাদকে দেওয়া ছাড়ের সামাল দিতেই এটা তাকে করতে হয়েছে। এই খেলার অবশ্য বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলই। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কংগ্রেসের প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের মোহভঙ্গ ঘটিয়েছে। জনতা দলের মত দলগুলো কংগ্রেসের এই দুরবস্থার সুযোগ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদেরও লক্ষ্য সেই মৌলবাদী অংশটিকেই দলে টানা।

বিজেপির হিন্দুরাষ্ট্র তথা ধর্মীয় তাণ্ডব নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হিসাবে মুসলিমদের মধ্যে মৌলবাদকেই শক্তিশালী করেছে। প্রগতিশীল সমাজসংস্কার হিসাবে বহুবিবাহের বিরোধিতা করা এক জিনিস, কিন্তু একে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী করা উদ্ভট ব্যাপার। বহু সন্তানের জন্মদান সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য—কোনও বিশেষ ধর্মের ব্যাপার নয়। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহের খুব একটা প্রচলন নেই বললেই চলে। তাছাড়া একটু সাধারণ বুদ্ধি খাটালেই বোঝা যায়, নারী-পুরুষের বর্তমান অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে এটা কখনই বহুলপ্রচলিত হতে পারে না, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী হওয়া তো দূরের কথা। এক অভিন্ন নাগরিক আইন তথা মুসলিম নারীদের অধিকার নিয়ে বিজেপির দুশ্চিন্তা আসলে বিরাট ভাঁওতাবাজী—মুসলিম সত্তার ওপর এক সামগ্রিক আক্রমণের অংশবিশেষ। শাহবানু মামলায় তার হস্তক্ষেপ কেবল গোঁড়া মুসলমানদের পাল্টা আঘাতকেই ডেকে আনে। ফলে এক প্রগতিশীল সমাজ সংকারের ব্যাপারে মুসলিম জনগণের মধ্যে যথেষ্ট সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তা ধাক্কার মুখে পড়ে।

হিন্দুভারতে মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করার কথা বলে বিজেপি তাঁদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতকেই শক্তিশালী করছে। একইভাবে মুসলিম সত্তাকে হিন্দু 'সাংস্কৃতিক' সত্তায় মিলিয়ে দেওয়ার বিজেপির দাবিও ভারতের মিশ্র প্রকৃতিকে সরাসরি নাকচ করারই সমার্থক। বিজেপি হিন্দু সত্তাকেই ভারতীয় সত্তা হিসাবে চালানোর যত চেষ্টা করুক না কেন, সংঘ পরিবারের মতাদর্শগত আক্রমণ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তান সম্পর্কে মোহকেই জিইয়ে রাখবে ও শক্তিশালী করবে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুস্পষ্ট হিন্দু পক্ষপাতের জন্যই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল পাকিস্তান সম্বন্ধে এক মোহ। আর আজ সংঘ পরিবারের হিন্দুত্বের আস্ফালনের দরুণই তা টিকে থাকছে, শক্তিশালী হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পুনরাবৃত্তি করে আজ আবার তারা নয়া ঔপনিবেশিক বিপদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের প্রতিরোধে ভাঙ্গন ধরাতে, তাকে দুর্বল করতে উদ্যত। সংঘ পরিবার আজ আবার তার প্রভুদের সেবায় হাজির—ঠিক যখন তার সেবার দরকারও সবচেয়ে বেশী।

যাই হোক, ভারতীয় মুসলিমদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শেষ কথা বিজেপি বলবে না। মুসলিম যুবকদের নতুন প্রজন্মের পাকিস্তানের প্রতি কোন আন্তরিক টান নেই, বরং তাঁরা ভারতে ভারতীয় মুসলিম হিসাবেই নিজেদের স্থান করে নিতে আগ্রহী। তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণাকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক নন। আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তাঁদের বামপন্থীদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। মুসলিমদের মধ্যকার প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীরা মুসলিম সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি তুলছেন, জোর দিচ্ছেন আধুনিক শিক্ষার ওপর, বিশেষতঃ নারীর অবস্থার উন্নতির ওপর। সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির কর্তব্য ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে এই বিকাশমান ধারাটিকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করা, যাতে তাঁরা ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সমান অংশীদার হয়ে উঠতে পারেন। ...

উপসংহারের পরিবর্তে

...

এই সেদিনও সংঘ পরিবারের তাত্ত্বিক বাহিনী মার্কসবাদের 'মৃত্যুকে' উল্লাসের সঙ্গে উপভোগ করেছেন এবং পশ্চিমবাংলা ও কেরলে তাঁদের বর্ধমান প্রভাবকে ঐ মৃত্যুর প্রমাণ হিসাবে সদম্ভে ঘোষণা করেছেন। আজ কিন্তু উত্তরপ্রদেশের বৌদ্ধিক চর্চার কেন্দ্রগুলোতে মার্কসবাদের এই পুনরুত্থানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁদের বেশ বেগ পেতে হয়। পাল্টা আক্রমণ হানার পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে ওঠে এবং সেখান থেকেই এই ধারাবাহিকের জন্ম।

দুঃখের কথা, সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক দর্শনের বিরুদ্ধে অধিকাংশ রচনাই এক উদারনীতিবাদী হিন্দু কাঠামোর মধ্যে আটকে থেকেছে ঃ রামের মহিমাকীর্তন, হিন্দু সহিষ্ণুতা ও *সর্ব ধর্ম সমভাবের* বিষয়বস্তু এবং তারই পরিপূরক হিসাবে গান্ধী ও বিবেকানন্দের উদার হিন্দু ভাবমূর্তিকে তুলে ধরা এবং সাম্প্রদায়িক বিবেকের কাছে আবেদন জানানো—ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরের প্রচারের মূল ধারা এই খাতেই রয়েছে। ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে এক নতুন উপলব্ধির কথা বলে বাম নেতৃবৃন্দও এর সুরে সুর মেলান। সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-পন্থীদের কাছে যিনি খুব কাছের ছিলেন, সেই নেহরুও অপাংক্তেয় হয়ে পড়লেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বামেদের রচনায় নেহরুকে সরিয়ে তার স্থান গ্রহণ করে গান্ধী। কপট ধর্মনিরপেক্ষতা আর কি হতে পারে!

হিন্দু রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী অন্তর্বস্তু তথা ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোর ব্যাপকতম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু একটি বাম কেন্দ্রকে নতুন করে সংহত করে তোলার বিষয়টি অবহেলিত থাকায় তা মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদের পথকেই প্রশস্ত করে। একথা বলাই বাহুল্য যে, এক শাণিত প্রতি আক্রমণ ছাড়া তীব্র সাম্প্রদায়িক

সাতের পাতায় দেখুন

এক সমাজতাত্ত্বিকের মোদী আলোচনা নিয়ে কিছু প্রশ্ন

পার্থ চট্টোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক। তিনি সম্প্রতি বর্তমান মোদী মডেল সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ সাক্ষাতকারে তাঁর মূল্যায়নের কথা বললেন। তাঁর মূল বক্তব্য হল, মোদী উন্নয়নের অ্যাজেণ্ডায় ব্যর্থ হলে তবেই হিন্দুত্বের অ্যাজেণ্ডাকে ব্যবহারে ফেরাবেন।

উপরোক্ত সমাজতাত্ত্বিকের এই মূল্যায়ন অবশ্যই প্রশ্নের উদ্রেক করে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মোদী প্রবণতাকে এভাবে ভেঙে বোঝানোর প্রয়োজন হচ্ছে কেন? শুধু তাই নয়, মোদী দাবি করতে পারেন তাঁর অ্যাজেণ্ডায় 'সার্বিক উন্নয়নের' গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা আমাদের সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনাবিহীনভাবে পুনরুল্লেখ করলেন কোন গুরুত্ব অনুভব করে? মূলত এরকমই দু-তিনটি গুরুতর বিতর্কমূলক বিষয় রয়েছে যা আলোচনার বিশেষ দাবি রাখে। সে কথায় আসার আগে আমাদের সমাজতাত্ত্বিকের বক্তব্যে হুবহু নজর বুলিয়ে নেওয়া যাক।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য—"... প্রচার অভিযানে মোদী হিন্দুত্বের জয়গান না করে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপরেই বিরাট জোর দিয়েছিলেন। দেশজুড়ে শৌচাগার নির্মাণ এই মানব উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ... মোদী নিজে অক্লান্তভাবে উন্নয়নের অ্যাজেণ্ডার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এমনকী একথাও বলেছিলেন যে, 'বিজেপিকে ভোট দিতে চান না, দেবেন না, কিন্তু আমি উন্নয়নের দিশারি, আমাকে ভোট দিন'। এটা কিছুটা অবাক কাণ্ড—বিজেপি নির্বাচনী অভিযানে মেতে উঠেছে কিন্তু সেখানে ধর্মের কথা শোনা যাচ্ছে না। উপরন্তু, এই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ও বক্তব্যকে আঁকড়ে ধরেই তিনি বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্বেও জয়ী হয়েছিলেন। ... দেশের বিরাট বিরাট কর্পোরেট সংস্থাগুলো মোদীকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছিল এবং প্রভূত অর্থ সাহায্যও করেছিল। এই প্রত্যাশায় যে, ধর্ম নিয়ে দাপাদাপি করার পরিবর্তে মোদীর সরকার উন্নয়ন যাত্রার পথিক হবে। এই উন্নয়ন নিয়ে অর্থাৎ মোদী ঘোষিত নীতি ও কার্যক্রম নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক হতে পারে, কিন্তু তাঁর উন্নয়নের মডেলে যে হিন্দুত্ববাদের বিশেষ ছোঁয়া নেই, এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। ...

... প্রথমে তিনি তাঁর কথিত সার্বিক উন্নয়নের ওপর জোর দেবেন। উনি যদি এই প্রচেষ্টায় সফল হন, তা হলে হিন্দুত্ব নিয়ে দাপাদাপি না করলেও চলবে। কিন্তু কোন কারণে তিনি যদি বিফল হন, তখনই তিনি হিন্দুত্বের পথিক হতে পারেন। ... সঙ্ঘ পরিবার কিন্তু তাদের নিজস্ব পৃথক অ্যাজেণ্ডা একেবারেই পরিহার করেনি। ... ইতিমধ্যেই গোরক্ষা কর্মসূচী নিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা মুখর হয়েছেন। ... এবারের নির্বাচনে দুটি রাজ্যে বিজেপি আশাতীত ভালো ফল করেছে। রাজ্য দুটি হল পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম। এই দুটি রাজ্যে আগামী দিনে বিজেপি তার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের দিকে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে। ...

... হিন্দুত্বের প্রবক্তারা তাঁদের দাবি জানাবেন। মোদীর পক্ষে এদের চাপ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। ... তিনি কতটা কীভাবে অনুসরণ করবেন সেটাই দেখার বিষয়। ...

... মোদী যে মডেলের কথা বলছেন, তা যদি দেশে সার্বিক সমৃদ্ধি আনতে পারে, সে ক্ষেত্রে আমাদের ধর্মের দাপাদাপি দেখতে হবে না। কিন্তু অন্যদিকে উন্নয়নের অভিযান যদি ব্যর্থ হয়, তবে সুরক্ষিত হিন্দুত্বের তাসটি সযত্নে ব্যবহার করা হবে।" (এই সময়, ১৯ আগস্ট '১৪)।

এবার আসা যাক আমাদের সমাজতাত্ত্বিকের কথার পিঠে কথায়।

প্রথমত, এটা ঠিক যে, গত লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় নরেন্দ্র মোদী বিজেপির পয়লা নম্বর নেতার আসনটা করে নিয়েছেন। এ নিয়ে দলে তাঁকে না-পসন্দ্ লবির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এঁটে উঠতেও হয়েছে। কিন্তু সেটা দেশের শাসকশ্রেণীর যে কোন ক্ষমতাধর দলে যেমন শক্তির প্রভাব খাটানোর সংঘাতের কারণে হয়ে থাকে, মোদীর ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে, তার বেশী কিছু নয়। এর মধ্যে হিন্দুত্বের পরিবর্তে উন্নয়ন প্রতিশ্রুতিকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়ার কোনও ধর্মযুদ্ধের ফসল নেই। মোদী এবারের নির্বাচনে নিজেকে সর্বতোভাবে জাহির করার চেষ্টা চালাতে বাকী কিছু রাখেননি। একজন আদ্যন্ত আর এস এস সেবক থেকে বিজেপির এক নম্বর নেতা হয়ে ওঠার বিশেষ চরিত্র-নেতা হলেন মোদী। তাঁর শাসনাধীনে গুজরাটকে তিনি হিন্দুত্বের ধ্বজা ওড়ানো, রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ, তার প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক গণহত্যা সংগঠিত করা, সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে সন্ত্রস্ত করে রাখা এবং এই ভিত্তির উপর কর্পোরেট পুঁজির লুটেরা স্বার্থবাহী উন্নয়ন নীতির 'স্বর্গরাজ্যে' পরিণত করেছেন। আর এই দৌলতেই তিনি তাঁদের দলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের পেছনে ফেলে দিয়েছেন। দলে তাঁকে অপছন্দ করার কিছু নেতা থাকলেও তাঁর অপরিহার্যতা বুঝে শেষমেশ দলও তাঁকে দলনেতার আসন দিয়েছে।

'দেশজুড়ে শৌচাগার নির্মাণের' মোদী প্রতিশ্রুতি শুনে এটা বিবেচনা করার মানে হয় না যে, এর মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে মোদীর 'মানব উন্নয়ন' ও 'সার্বিক উন্নয়ন' নিয়ে ভাবনার সুলক্ষণ। শৌচাগারের দাবি এক দীর্ঘ অবহেলিত দাবি, যে কলঙ্ক জগৎসভায় এই দেশকে আজও চরম লজ্জায় ফেলে দেয়। সুতরাং সবে এই প্রকল্পটি রূপায়ণের ঘোষণা শুনে মোদীকে বিশেষ তারিফ করার কিছু নেই। বরং শঙ্কা থাকছে ষোল আনা, প্রতিশ্রুতি কতটা রূপায়িত হবে? বিজেপির ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির স্বার্থ বি-যুক্তভাবে বাস্তবায়িত হবে কীনা? কেননা মোদীর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া থেকে বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রীত্বে উত্তরণ ঘটে গেলেও গুজরাটেই শৌচাগারের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা এখনও ৬২ শতাংশ।

মোদী যে তাঁকে ভোট দেওয়ার আবেদন রেখেছিলেন সেটা তাঁর নিজেকে আকর্ষণ করানোর স্বয়ম্ভু চমক বা স্টাইল, তার মধ্যে হিন্দুত্বকে পরিহার করে চলার কোনও আশ্চর্য ছিল না। দলের পক্ষে নিজে ভোট চাওয়া বা নিজের চাওয়ার মাধ্যমে দলের পাওয়াটা নিশ্চিত করা—এই স্টাইল মোদীর আগে-পরে-পাশাপাশি অনেক নেতানেত্রীকেই নিতে দেখা গেছে। এ ব্যাপারে কোনও অভিনবত্ব নেই। নির্বাচনের পর্বে বিজেপির তরফে সেভাবে ধর্মের জিগির তোলার ঘোষিত অ্যাজেণ্ডা খোলা হয়নি, সেটা ছিল জমিয়ে রাখা অ্যাজেণ্ডা, কিন্তু বিজেপি চুটিয়ে রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ চালিয়েছে, লাগাতার দাঙ্গা করেছে, নারী-শিশু সহ গণহত্যা করেছে, আর তার জন্য বাবরি মসজিদ ধ্বংসের রাজ্য উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরকে বিশেষ পরীক্ষাগার বানিয়েছিল। ঐ সাম্প্রদায়িক অভিযান, যা ৬ মাসের ওপর চালানো হয়েছিল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার মানুষকে নিকেশ করেছিল। সেটা চলেছিল যে কুখ্যাত অমিত শাহ্‌র পরিচালনায়, তিনি গুজরাট ওস্তাদির দৌলতে মোদীর শংসাপত্র পেয়ে মোদীরই বিশেষ উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশে বদ্‌লি হয়েছিলেন। যে অমিত শাহ্ তার সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ত অবদানের জন্য মোদীর দলের নতুন সভাপতি হয়েছেন এবং বিজেপির পরবর্তী সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য হাসিল করতে একটা জাতীয় স্তরের টীম বানানোর ক্ষমতা পেয়ে গেছেন। সুতরাং নির্বাচন পর্বে বিজেপির অভিযানে তেমন ধর্মের ঘোষণা হয়ত শোনা যায়নি। কিন্তু তার চেয়ে বড় বিষয় হল, আড়ালে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ত কার্যকলাপের বীভৎসতা চলেছিল দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে। আর, কর্পোরেট পুঁজি যে সবকিছু নিয়ে মোদী হাওয়ার বাজী ধরেছিল সেটা 'মানব উন্নয়ন'-'সার্বিক উন্নয়ন'-এর প্রত্যাশায় নয়, ধর্মের দাপাদাপি বন্ধ করার প্রত্যাশায়ও নয়, তাদের একমাত্র প্রত্যাশা—মুনাফার জন্য মোদী জমানাই হবে পরম পাওয়া। এমনকি শৌচাগারের রূপায়ণের জন্যও আউট সোর্সিং পেতে কর্পোরেট পুঁজি মুখিয়ে থাকতে পারে কেবল তাদের মুনাফার স্বার্থেই। শৌচাগারের স্বাচ্ছন্দ্যায়ন নিয়ে তাদের মাথাব্যথা থাকবে না। মোদী যে কেমন 'মানব উন্নয়ন'-'সার্বিক উন্নয়ন'-এর ধ্বজাধারী সে তো সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি, গণবণ্টন ব্যবস্থার সংকোচন ও বিশেষত 'খাদ্য সুরক্ষা'র বিসর্জন নীতি নেওয়ার মতিগতিতেই ধরা পড়ছে। মোদীর উন্নয়ন নীতি তাই শুধু বিমূর্ত তর্কবিতর্কের নয়—কর্পোরেটমুখী নীতি এবং বিপরীতে জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার। আর, মোদীর উন্নয়ন মডেলে হিন্দুত্ববাদের ছোঁয়া নেই—এই তর্ক অবান্তর। আজকের ভারতের শাসকশ্রেণীর দলগুলো অতি ধুরন্ধর। বলাবাহুল্য বিজেপি আরও ধুরন্ধর বটেই। সরাসরি 'হিন্দুত্বের জন্যই কেবল উন্নয়ন'—এরকম অ্যাজেণ্ডা ঘোষণা করা মুশকিল। কিন্তু মোদীর দলের কাছে রাষ্ট্র গঠনের সামগ্রিক ও চূড়ান্ত লক্ষ্য যেহেতু হিন্দুরাষ্ট্রই, আর ক্ষমতায় যেতে, ক্ষমতায় থাকতে, ক্ষমতাকে সর্বব্যাপী করতে যেহেতু হিন্দুত্বের অ্যাজেণ্ডা একটা স্থায়ী আমানত, তাই উন্নয়নের সামাজিক ফলভোগের ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব এক অনিবার্য পরিঘটনা। তাছাড়া, মোদীর 'উন্নয়ন বাজেট' থেকে প্যাটেলের মূর্তি বসাতে যে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হল, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর পুনরায় নামাঙ্কন করা হচ্ছে যে হিন্দুত্বের বিভিন্ন প্রজন্মের নেতাদের নামে—এগুলো কি হিন্দুত্বের 'ছোঁয়া' কেন, দাগ দেগে দেওয়া নয়!

'সার্বিক উন্নয়ন'-এর লক্ষ্যে নয়, কর্পোরেট পুঁজির লুণ্ঠনের স্বার্থ উপযোগী উন্নয়নযজ্ঞের মোদী ম্যাজিক পলিসি সফল হবে না বিফল হবে, সমৃদ্ধি আনবে না সংকটে পড়বে—সে সব তো আরও পরিষ্কার হবে সময়ের সাথে সাথে। কিন্তু মোদী কর্পোরেটমুখী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় তাঁর সাজ পোশাক-আবাস পাল্টে গেলেও হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী চরিত্রটা পাল্টে গেছে—এটা ভাবানোর কোনো সুযোগ নেই। সঙ্ঘ পরিবারের প্রধান পুরোহিত মোহন ভাগবত প্রকাশ্যেই ফের বলছেন—এদেশের রাষ্ট্রকে হতে হবে হিন্দুরাষ্ট্র, গোরক্ষা কর্মসূচীতে হিন্দুত্ববাদীরা আবার সরব হচ্ছে, অমিত শাহ্ রয়েছেন রাজনীতির উত্তরোত্তর সাম্প্রদায়িকীকরণের দৌড়ে—পশ্চিমবঙ্গ থেকে জম্মুর পাক সীমান্ত পর্যন্ত। নির্বাচন পর্বে খোদ মোদীর মুখে বারবার শোনা গিয়েছিল হিন্দুত্বের সন্ত্রাসের হুমকি—সংখ্যালঘুরা তৈরী থাকুক, গেরুয়া শক্তি ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘুদের পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। এখন শোনানো হচ্ছে ১৯৫১-কে ঐ ফেরত পাঠানোর ভিত্তিবর্ষ ধরার কথা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানকে মোদীর অভিষেকে আমন্ত্রণ জানানো হল, তারপরে এক ছুতোয় একতরফা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বাতিল করা হল। সীমান্তে যদি পাক গোলাবর্ষণ হয়ে থাকে, তা বন্ধ করতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় আগ্রহ দেখানোই তো সময়োচিত সঠিক প্রত্যুত্তর হতে পারত। তা না করলে পাল্টা ছোঁড়া হচ্ছে পাক-বিরোধী হুঙ্কারের ও হিন্দুত্বের বিষোদগারের গোলা। কারণ, সামনে জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচন। গোপন উদ্দেশ্য হল, নির্বাচনে বিজেপির সপক্ষে হিন্দুত্বের হাওয়া তোলা এবং কাশ্মীরিয়ৎ-এর সপক্ষে রয়েছে যে সংবিধানের ৩৭০ ধারা তার বিরুদ্ধে ফের একবার বিতর্ককে খুঁচিয়ে তোলা। এই সবই চলছে মোদী জমানায়। তাছাড়া আসামে ও পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের নীল নকশাও তো আমাদের সমাজতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় নিজেও বাস্তবিকই অনুমান করছেন। তাহলে মোদীর আর এখন হিন্দুত্ববাদী ব্যবহারগুলো দরকার পড়ছে না—এই বক্তব্যে গ্রহণযোগ্য যুক্তি কোথায়? সেই যুক্তি ধোপে টেঁকে না। বরং এই মূল্যায়নই বাস্তবিক, মোদী বসেছেন কর্পোরেটমুখী উন্নয়নের চালকের আসনে, অমিত শাহ্‌দের বসাচ্ছেন রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ ও মেরুকরণ অভিযান সংগঠিত করার চালকের আসনে, আর হিন্দুত্বের প্রচার অভিযান চালানোর আসনে তো রয়েছেনই মোহন ভাগবত থেকে প্রবীণ তোগাড়িয়ার দল। স্বয়ং মোদীই এই সমন্বয়ের ম্যাজিসিয়ান বা যাদুকর। এই অখণ্ড একীকৃত স্বরূপের বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে না পারলে বিপজ্জনক একপেশেপনা আর সতর্কতা-সজাগতার অভাববোধ থেকে যেতে পারে।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

গৈরিক ষড়যন্ত্রের স্বরূপ

ছয়ের পাতার পর

আক্রমণের মুখে সামগ্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রচারই মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। কে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দায়িত্ব নেবে? সেই দায়িত্ব একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের উপরই বর্তায়।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের জনপ্রিয় প্রচার অভিযানে আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম ঃ

(ক) স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন হিন্দু প্রতীকের, বিশেষতঃ রামরাজ্যের, ব্যবহার করার গান্ধীবাদী পদ্ধতির বিরুদ্ধে এবং একেই মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতার প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করি।

(খ) রাধাকৃষ্ণণ ধর্মনিরপেক্ষতাকে *সর্ব ধর্ম সমভাব* হিসাবে যে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন—এবং যা সরকারি অবস্থান হয়েও দাঁড়ায়—তার বিরুদ্ধে এবং আমরা বলি যে ধর্মের প্রতি যে কোন আধুনিক রাষ্ট্রের নীতি কেবলমাত্র হতে পারে *সর্ব ধর্ম বর্জিত*।

(গ) রামের মত একটি ধর্মীয় চরিত্রকে জাতীয় নায়ক হিসাবে তুলে ধরার যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে এবং আমরা বলি যে এই মর্যাদা একমাত্র জননায়ক ভগৎ সিংয়েরই প্রাপ্য।

(ঘ) দেশের ঐক্য রক্ষাকারী শক্তি হিসাবে হিন্দু রাষ্ট্রকে তুলে ধরার যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে এবং আমরা বলি যে, ইতিহাসের শিক্ষা যদি সত্যি হয় তবে হিন্দুরাষ্ট্র অবশ্যই ভেঙ্গে গিয়ে অসংখ্য রাজ্যের জন্ম দেবে। শিবসেনার মারাঠা রাষ্ট্রের বিকাশের যে লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে তা এই বিষয়টিকেই দেখিয়ে দেয়।

(ঙ) ১৯৪২-এ তার ভূমিকা সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের সমগ্র পর্যায়ে আর এস এস-এর ভূমিকা, সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যাকে পাকিস্তানে নির্বাসিত করতে হবে এই দাবি তুলে দেশকে বিভাজনের দিকে ঠেলে দেওয়া ও দেশ বিভাগকে তার সমর্থন এবং জরুরী অবস্থার সময় ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে তার দহরম-মহরমের বিরুদ্ধে এবং আমরা বলি যে আর এস এস তার মতাদর্শগত প্রেরণা লাভ করেছিল এক বিদেশী মতাদর্শ, নাজিবাদ থেকে।

(চ) মুসলিম জুজুর কথা বলে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়ে আর এস এস তার নিজস্ব ধারায় ঔপনিবেশিক প্রভুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হতে না দিয়ে তাকে যেভাবে বিক্ষিপ্ত করেছিল তার বিরুদ্ধে এবং আমরা বলি যে, আজ আবার যখন নয়া-উপনিবেশিবাদের বিপদ ঘনিয়ে আসছে তখন সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

(ছ) পাক বিরোধিতাকে ভারতবর্ষের বিদেশনীতির অক্ষ করে তোলার বিরুদ্ধে এবং আমরা বলি যে পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গী এবং জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার এক ইতিবাচক দ্বিপাক্ষিক সমাধান ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ—এই তিন স্বাধীন রাষ্ট্রকে নিয়ে এক মহাজোট গড়ে তোলার প্রস্তাবও আমরা করি।

পাল্টা আক্রমণ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় আমরা দেখাই যে বুর্জোয়াদের সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল অংশ এবং জমিদার শ্রেণী ও উচ্চবর্ণের মধ্যে বিজেপির সামাজিক ভিত্তি, নাগরিক ও রাজনৈতিক জীবনে সাধু ও মহন্তদের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ, সমাজের সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত অংশটিকে নিয়ে করসেবকের রূপে এক জঙ্গী সংগঠন গড়ে তোলা, ইতিহাসকে বিকৃত করে তোলা, সংগঠিত অভিযানের মাধ্যমে ঘৃণা সৃষ্টি এবং বিদ্বৎ সমাজে যে কোন বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দিতে বদ্ধপরিকর ভুঁইফোড় বুদ্ধিজীবীর দল—এই সমস্তই মিলেমিশে তৈরী করেছে নির্ভেজাল ফ্যাসিবাদকে। (সমাপ্ত)

তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট ঃ

সুনিয়ার ভয়ঙ্কর ঘটনা রাজনৈতিক রোষেই

গত ২১ আগস্ট গণমঞ্চের ১৩ জনের এক প্রতিনিধি দল ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে নিহতের পরিবার ও স্থানীয় জনগণের কাছে ঘটনার বিবরণ ও তাদের মতামত জানতে গণমঞ্চের নেতৃত্বে কাঁথির সুনিয়া গ্রামে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রসেনজিৎ বোস, শুভনীল চৌধুরী, বোধিসত্ত্ব রায়, অজয় বক্সী, অমিতা দে, আরতি কয়ড়া, অর্চনা ঘটক, চন্দ্রাস্মিতা চৌধুরী, আশিষ মাইতি, শুকচাঁদ মণ্ডল, নিরঞ্জন সুহিয়ান ও বুদ্ধ মণ্ডল এবং এই প্রতিবেদক।

কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের সুনিয়ার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। ২০১১ সাল থেকে ঘর ছাড়া সি পি এম কর্মীর বাড়ীতে তথ্যানুসন্ধানকারি দল পৌঁছায় বেলা ১২টা নাগাদ। মিডিয়ার প্রতিনিধিরাও সেখানে ছিলেন। ছিল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীও। বাড়ীর উঠানে বৃদ্ধ মা-বাবা বসেন প্রতিনিধিদলের সাথে কথা বলতে। চোখ-মুখে আতঙ্কের ছাপ।বড় বৌমা নিহত, বাড়ীতে আর কেউ নেই। প্রতিবেশীরা ভয়ে আসছেন না। গ্রাম পুরুষ শূন্য। সি পি এম সমর্থক ৪৮টি পরিবার গ্রাম ছাড়া। ১৫ থেকে ১৭ আগস্ট দুদিন ধরে বিভীষিকাময় উৎপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। একদিকে তৃণমূলের নেতা-গুণ্ডাদের বর্বরতা, অন্যদিকে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা। বৃদ্ধা বলেন, তাঁদের বাড়ীতে বন্দুক আছে এই মিথ্যা অজুহাতে ছোট ছেলে ও বড় বৌমার কাছে তৃণমূলের লালু (দেবাশীষ ভুঁইয়া), দেবাশীষ মাইতি ও প্রদীপ গিরি-রা ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা চায়। এর প্রতিবাদ করলে ছোট ছেলের সামনে বড় বৌমাকে তারা বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরে ১৬ আগস্ট বৃদ্ধা জানতে পারেন যে তৃণমূলীরা তাঁকে সুনিয়া চরের কাছে পুরজানা গ্রামে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধোর করে, পরে তিনি কোনক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ী আসেন। আবার ১৭ তারিখ সকাল ১০টা নাগাদ সেই লালু ভুঁইয়ারা প্রায় দু-শো লোক নিয়ে এসে চড়াও হয়। সন্ধ্যা ৫টায় ডাঃ পঞ্চানন গুছাইত বাড়ীতে আসে এবং ২/৩ ঘন্টা থেকে ছোট ছেলেকে ওষুধ দেয়। তখন বৌমাও ছিল। ছেলে জ্যাঠার বাড়ীতে যাওয়ার বের হয়। তাঁকে বাড়ীর কাছে কিছুটা দূরে, গ্রামের রাস্তায়

সুনিয়ার রোষের শিকার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলছেন তথ্যানুসন্ধানী দল

ঘিরে মারধোর করা হতে থাকে। তখন প্রাণে বাঁচতে বড় বৌমা বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে পাশের গ্রাম ছনবেড়িয়ায় একজনের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। কিন্তু তাতেও রক্ষা পাননি। জানা যায়, রাস্তায় ফেলে মহিলাকে মারছিল ওরা। গোটা গ্রাম হামলাকারীরা ঘিরে রেখেছিল। ভয়ে প্রতিবাদ করতে কেউ আসেননি। ১৮ আগস্ট সোমবার সকালে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় মহিলার দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। নিহত গৃহবধু স্থানীয় আই সি ডি এস কর্মী ছিলেন। প্রতিনিধি দলের মহিলা সদস্যরা আলাদাভাবে বৃদ্ধা শাশুড়ির সাথে পরে প্রতিবেশী মহিলাদের বাড়ী গিয়ে ঘটনার বিবরণ জানতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, আর খুব বেশি জানা যায়নি।

পরে গণমঞ্চের প্রতিনিধিদলের পক্ষে প্রসেনজিৎ বোস সাংবাদিক সাক্ষাতকারে বলেন, রাজ্যজুড়ে নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটলেও রাজনৈতিক রোষে সুনিয়ার ঘটনা খুবই ভয়ঙ্কর। জরিমানার টাকা না দিতে পারায় চরম হেনস্থা করা হয়েছে এই পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে। চরম নির্যাতনের পর খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ঐ বধুকে। হুঁসিয়ারি দেওয়া হয়েছে এলাকার মানুষকে। এলাকার বাক্ স্বাধীনতা এখন বিপন্ন। পুলিশ এই ঘটনাকে নিছক আত্মহত্যা বলে চালাতে চাইলেও মানুষের সাথে কথা বলে প্রমাণ মিলেছে গণধর্ষণ ও খুনের। তথ্যানুসন্ধানীদলের দাবি গৃহবধু তৃণমূলের রোষের শিকার হয়েছেন। এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী পুলিশ। কারণ পুলিশকে অত্যাচারের কথা জানানোর পরেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বরং শাসক দলের মদতে হুমকি দিয়েছে বিপন্ন ঐ পরিবারের মানুষকে। গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা প্রশ্ন তোলেন এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও। তাদের অভিযোগ এলাকায় পুলিশ মোতায়েন থাকলেও ছিল ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। মঞ্চের প্রতিনিধিদলের সদস্যা চন্দ্রাস্মিতা চৌধুরী ঘটনার নিন্দা করেন। তিনি বলেন সাংসদ তাপস পালের বিকৃত মন্তব্যের জেরেই ঘটেছে এই ঘটনা।

ফেরার পথে কথা অনুযায়ী সাক্ষাত হল নিহতের স্বামী ব্যোমকেশ গিরির সঙ্গে। তিনি বললেন, ১৯৮২ সাল থেকে সি পি এমের সাথে আছেন। ২০১১ সালের নভেম্বর সাল থেকে ৪৮ জন সি পি এম কর্মী ঘর ছাড়া অবস্থায় আছেন। ওনার জগদীশপুরের দোকানটি তৃণমূলের দুষ্কৃতিরা ভাঙ্গচুর করে দিয়েছে। উনি বর্তমানে শংকরপুরে সুটকি মাছের ব্যবসা করেন। তাঁর মতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য দেবাশীষ মাইতি, প্রদীপ গিরি, সুবল গিরি—ওরাই হামলার নেতৃত্বে ছিল। ওরা ১২ লাখ টাকা দিতে হবে বলে দাবি করে। আমার স্ত্রীকে এনে জগদীশপুরের মোড়ে নিয়ে অকথ্য অত্যাচার করে এবং অর্ধমৃত অবস্থায় বাড়ীতে ফেলে চলে যায়। ময়না তদন্তের পর আমার স্ত্রীকে দেখেছি। মৃতদেহ নেওয়ার সময় আই সি সাহেব বলেন, 'আমি যা যা বলব তা লিখে দিতে হবে।' ১৮ তারিখ ছোটভাই বলে আমাকে দিয়ে লেখানো হয়েছে যে, আত্মহত্যা করেছে। আমার অভিযোগে ধর্ষণ করা হয়েছে বলা আছে। আই সি-র নাম সুবীর দত্ত। পরে প্রতিনিধিরা কাঁথি থানায় যান। আগে জানানো সত্ত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ ছিলেন না। অগত্যা প্রসেনজিৎ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত ওসি এবং এস পি-কে তীব্র ক্ষোভের কথা জানান। এই ঘটনায় ১২ জনের নামে এফ আই আর করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩ জনকে এখন অবধি গ্রেপ্তার করা হয়েছে—তারা হল স্বপন জানা, মানিক লাল গিরি এবং চন্দন জানা।

তথ্যানুসন্ধানীদলের দাবি—

(১) অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে (২) সমস্ত দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে (৩) সুনিয়া সহ আশেপাশের গ্রামগুলোকে সন্ত্রাস মুক্ত করতে হবে এবং গ্রাম ছাড়া মানুষজনকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে (৪) মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে হবে (৫) তোলাবাজী বন্ধ করতে হবে। দলতন্ত্র বন্ধ করতে হবে এবং (৬) নির্যাতিত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে।

- অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী

ধর্ষক খুনীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদী নাগরিক পদযাত্রা

হুগলী জেলার হিন্দমোটর তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী তরুণীকে ধর্ষণ এবং হত্যার জন্য অভিযুক্তদের ও তাদের আড়াল করার চেষ্টায় জড়িত সমস্ত ব্যক্তির অবিলম্বে কঠোর শাস্তির দাবিতে পথে নামল উত্তরপাড়া থানা এলাকার ''নাগরিক সমন্বয় মঞ্চ''।

২৪ আগস্ট বিকালে মঞ্চের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হিন্দমোটর বিনয়-বাদল-দীনেশ মোড়ে সমবেত হন দ্বিশতাধিক নাগরিক। এলাকার এক ঝাঁক ছাত্রছাত্রী ও সদ্য তরুণরা স্বতস্ফূর্তভাবে দেশজোড়া নারী নির্যাতন ও তার প্রতিবাদের ঘটনার তথ্য ও চিত্র সম্বলিত বেশ কিছু প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার তৈরী করে উপস্থিত হন। বুকে কালো ব্যাজ লাগিয়ে ও হাতে মোমবাতি নিয়ে নাছোড় জেদ দিয়ে শুরু হয় দৃপ্ত পদচারণা। হিন্দমোটরের দেশবন্ধু পার্ক, নিউ স্টেশন রোড, জনবহুল স্টেশন বাজার সহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে মিছিল। যারা সামিল হয়েছিলেন তাদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মহিলা, তাঁরা ছিলেন পদযাত্রার সামনে। বিশিষ্ট কিছু কবি-সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এই কর্মসূচী। প্রচার গাড়ী থেকে সবিস্তারে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে বারংবার আরও ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে এই প্রতিবাদে সামিল হতে আবেদন জানানো হয়। সমগ্র পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন ''নাগরিক সমন্বয়''-এর দুই আহ্বায়ক স্বপন মজুমদার ও বিশ্বজিৎ দাস। প্রায় দুঘন্টা পরিক্রমার পর পথ চলা শেষ হয় নির্যাতিতা তরুণীর বাড়ি রাধাগোবিন্দনগর আবাসনের সামনে। সেখানে মিছিল চেহারা নেয় জনস্রোতের। মোমবাতির শিখায় নির্যাতিতাকে স্মরণ করে মনের প্রতিবাদী আগুন জ্বালিয়ে রাখেন প্রতিবাদী জনতা, পালন করেন নীরবতা। নির্যাতিতার মা উপস্থিত ছিলেন এই স্মরণ কর্মসূচীতে। যতদিন অভিযুক্তরা শাস্তি না পাচ্ছে, আন্দোলন চলতে থাকবে।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ৬-৭ লাইনে হবে ''পাড়ুই তদন্তে পুলিশের ভূমিকাকে...''; তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষ লাইনে হবে ''...পুলিশের কাজে আদালতের নাক গলানোর...'' চতুর্থ অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইনে ''...অপরাধের বিচারের গুরুত্ব লঘু করে....''।

কমরেড আবু হোসেনের ২২তম শহীদ দিবস

সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির নদীয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গত ১৮ আগস্ট ধুবুলিয়ায় সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের জেলা অফিসে কমরেড আবু হোসেনের শহীদ দিবস পালন করা হয়। তিনি ছিলেন বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলনের একজন জনপ্রিয় লড়াকু নেতা। গরিব কৃষকশ্রেণীর পরিবারের এই কমরেড ছোটবেলা থেকেই সি পি আই (এম এল) পরিচালিত কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হন। খাস জমির আন্দোলনে বিভিন্ন সময় তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে দেখে এবং সি পি আই (এম এল)-এর বিস্তার ঘটতে দেখে সেইসময়কার শাসকদল তাকে আটকানোর ঘৃণ্য পরিকল্পনা করে। তারা সমাজবিরোধীদের ভাড়া করে ১৯৯২-এর ১৮ আগস্ট কমরেড আবু হোসেনকে নৃশংসভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করায়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় এলাকার মেহনতী মানুষজন প্রতিবাদে সোচ্চার হন। ১৯৯৩ সালে কমরেড আবু হোসেনের গ্রাম নওপাড়া ২ নং অঞ্চলের পাত্রদহের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাধারণ মানুষ সি পি আই (এম এল) প্রার্থীদের নির্বাচিত করে। গত ২২ বছর ধরে এই জয়লাভ অব্যাহত আছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম এল) এই অঞ্চলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এই ধারাবাহিকতা কমরেড আবু হোসেনের দেখানো পথে এলাকার সংগঠনের লাগাতার লড়াই-আন্দোলনের ফসল। তিনি স্মরণে রয়েছেন গরিব মানুষের লড়াইয়ের মধ্যে, সংগঠনের মধ্যে।

কমরেড আবু হোসেনের স্মরণসভায় তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন তাঁর পাত্রদহ গ্রামের লড়াইয়ের সাথী ক্ষুদু সেখ, সোনাতলা গ্রামের গিয়াসউদ্দিন, সি পি আই (এম এল) নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক সুবিমল সেনগুপ্ত, এ আই এ এল এ-র রাজ্য সভাপতি সজল পাল এবং আনছারুল হক বিশ্বাস—যিনি পাত্রদহ তথা নওপাড়া ২ নং অঞ্চলের ধারাবাহিকভাবে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন তথা এ আই এ এল এ নদীয়া জেলা সম্পাদক তথা সি পি আই (এম এল) রাজ্য কমিটির সদস্য। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন গিয়াসউদ্দিন, আনছারুল হক, সুবিমল সেনগুপ্ত ও কাজল দত্তগুপ্ত।

"আজকের দেশব্রতী" সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com